ইতিহাসের
ধূলোকালি

পিনাকী ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

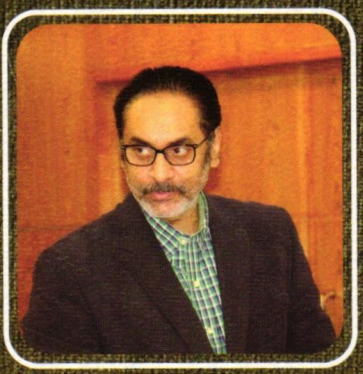

৯০-এর ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাঠ থেকে উঠে আসা যে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী সমসাময়িক বাংলাদেশে তুমুল আলোচিত হয়েছেন, লেখক হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন, 'পিনাকী ভট্টাচার্য' তাদের মধ্যে অন্যতম। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে দিশা খুঁজে ফেরা পিনাকী বিচিত্র সব রাজনৈতিক চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। নানাবিধ বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। মূলত দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি তাঁর লেখালিখির প্রিয় বিষয়। তিনি 'একাদেমিয়া' নামের একটি নিয়মিত পাঠচক্রের সভাপতি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন জনপ্রিয় ও আলোচিত অ্যাক্টিভিস্ট। ফেসবুকে নিজের সরব উপস্থিতি দিয়ে ইতোমধ্যেই তরুণ প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তুলেছেন। প্রশ্ন তুলতে ভালোবাসেন তিনি। প্রচলিত ধারাবাহিক বয়ানের বিপরীতে তাঁর যৌক্তিক প্রশ্ন নতুন করে ভাবতে শেখায়। স্বপ্ন দেখেন এক ইনসাফপূর্ণ নৈতিক বাংলাদেশের।

বই পরিচিতি

ইতিহাসের একধরনের নিজস্ব রং আছে। পুরো পৃথিবী একজোট হয়েও সে রং বদলাতে পারে না; উলটো নিজের মতো করে রাঙিয়ে যায় পৃথিবীকেই। অবশ্য বর্ণচোরা শ্রেণি ক্ষণিক সময় কৃত্রিম রঙের কারসাজির আয়োজন করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় কারসাজির খেলাঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ ইতিহাস মাথা উঁচু করে ঘোষণা করে– 'আমি সত্যের পক্ষে।'

ইতিহাসের দেয়ালে মিথ্যার প্রলেপ দেওয়ার অপচেষ্টা পৃথিবীর শুরু থেকেই চলমান। বিপরীতে একশ্রেণির সত্যাশ্রয়ী মানুষ সে মিথ্যা প্রলেপ সরানোর লড়াই জারি রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে কেউ প্রলেপ না সরালে স্বভাবতই ইতিহাসের গায়ে ধুলোকালির স্তূপ জমে যায়। এমন সন্ধিক্ষণে কাউকে না কাউকে ধুলোকালি সরানোর দায়িত্ব নিতে হয়। মিথ্যায় চাপা পড়া ইতিহাসকে ধুয়ে-মুছে নতুন করে সত্যের চাদর পরিয়ে দিতে হয়। জোর করে চেপে দেওয়া ইতিহাসকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হয়।

জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট, সমাজচিন্তক ও লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য ইতিহাসের ধুলোকালি মুছতে কলম হাতে তুলেছেন। প্রচলিত ভুল ইতিহাস থেকে ছেঁকে ছেঁকে পরিশুদ্ধ ইতিহাস বের করে এনেছেন। 'ইতিহাসের ধুলোকালি' গ্রন্থ বুদ্ধিবৃত্তিক দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত; যার ফলে আগামী প্রজন্ম নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর উপায় পাবে।

ইতিহাসের ধুলোকালি

(ইতিহাসের ভ্রান্ত উপস্থাপনার পর্দা সরিয়ে সত্য উন্মোচন)

পিনাকী ভট্টাচার্য

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

https://nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	০৫ আগস্ট, ২০১৯
চতুর্থ সংস্করণ	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	রিফাত হাসান
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৮২৫৪-০৪-২
ফিক্সড প্রাইস	২২০ টাকা

ফিক্সড প্রাইসে বই কিনুন

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসের এক নিজস্ব রং আছে। পুরো পৃথিবী একজোট হয়েও সে রং বদলাতে পারে না; উলটো নিজের মতো করে রাঙিয়ে যায় পৃথিবীকেই। অবশ্য বর্ণচোরা শ্রেণি ক্ষণিক সময় কৃত্রিম রঙের কারসাজির আয়োজন করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় কারসাজির খেলাঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ ইতিহাস মাথা উঁচু করে ঘোষণা করে—'আমি সত্যের পক্ষে।'

ইতিহাসের দেয়ালে মিথ্যার প্রলেপ দেওয়ার অপচেষ্টা পৃথিবীর শুরু থেকেই চলমান। বিপরীতে একশ্রেণির সত্যাশ্রয়ী মানুষ সে মিথ্যা প্রলেপ সরানোর লড়াই জারি রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে কেউ প্রলেপ না সরালে স্বভাবতই ইতিহাসের গায়ে ধুলোকালির স্তূপ জমে যায়। এমন সন্ধিক্ষণে কাউকে না কাউকে ধুলোকালি সরানোর দায়িত্ব নিতে হয়। মিথ্যায় চাপা পড়া ইতিহাসকে ধুয়ে-মুছে নতুন করে সত্যের চাদর পরিয়ে দিতে হয়। জোর করে চেপে দেওয়া ইতিহাসকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হয়।

জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট, সমাজচিন্তক ও লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য ইতিহাসের ধুলোকালি মুছতে কলম হাতে তুলেছেন। প্রচলিত ভুল ইতিহাস থেকে ছেঁকে ছেঁকে পরিশুদ্ধ ইতিহাস বের করে এনেছেন। 'ইতিহাসের ধুলোকালি' গ্রন্থ বুদ্ধিবৃত্তিক দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত; যার ফলে আগামী প্রজন্ম নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর উপাত্ত পাবে।

সম্মানিত লেখক এবং বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বলা হয়—'Truth never damages a cause that is just'। আমরা বিশ্বাস করি, সত্য ইতিহাস শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেই পৃথিবীবাসীর সামনে আসবে; বারবার, অবিরত।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ আগস্ট, ২০১৯

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ানে অনেক ঐতিহাসিক বিষয়কেই ভুলভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ইতিহাসের এই ভুল উপস্থাপনের একটা হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ভুল ইতিহাস চর্চা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আর আত্মপরিচয়ের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছে। ইতিহাসের ওপরে এই আরোপিত ভুল চর্চার ফলাফল হয়েছে মারাত্মক। ইতিহাসের ভুল আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত বয়ানের ফলেই বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতি চর্চার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এই ভুল ইতিহাস চর্চাকে অবাধে চলতে দিলে ইতিহাসের এই উদ্দেশ্যমূলক বয়ানই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সত্য বলে ধরে নেবে। ইতিহাসের ওপরে জমে থাকা ধুলোকালিকে যতটুকু পরিচ্ছন্ন করা যায়, ততই আমাদের জাতির মঙ্গল।

এই লেখাগুলো নানা সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে সৃষ্ট কোনো তর্ক বা প্রশ্নের জবাব দিতে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা নিজস্ব ধারায় লেখালিখি করি। এই গ্রন্থে সে ধারা পরিলক্ষিত হবে।

আশা করি বইটি থেকে পাঠক অনেক নতুন বিষয়ে জানতে পারবে, যা এই জাতির আগামীর পথচলাকে হয়তো কিছুটা সহজ করবে।

পিনাকী ভট্টাচার্য
১২ জুলাই, ২০১৯

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভারত ও বাংলা ভাগের দায়	১১
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান	২০
ভারতবর্ষ ও মুসলমান সম্পর্কে প্রচারিত ভুল ধারণা	২৪
মাদরাসা প্রসঙ্গ	২৯
মুক্তিযুদ্ধ, ভারত ও পাকিস্তান	৩৮
ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণা	৪৩
হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গ	৪৮
বখতিয়ার ও নালন্দা	৬২
রাশিয়া ও ইসলাম	৬৬
মৌলবাদ	৭০
কমিউনিস্ট দলগুলোর সমস্যা	৭৪
ইসলামে বিজ্ঞান	৮২
ভারত ও বাংলাদেশ ইস্যু	৮৭
মুক্তিযুদ্ধ	৯৩
আমেরিকা, পশ্চিম ও মুসলিম সম্প্রদায়	৯৮
ধর্ম ও সভ্যতা	১০৪
বাংলা ও মুসলমান	১১৩
ইসলামি রাজনীতি ও প্রথা : কিছু ভ্রান্ত ধারণা	১৩১
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ	১৪১
বিবিধ : ভুল ধারণা	১৪৭

https://nagorikpathagar.org

দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম

দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্য সেক্যুলার সমাজ মুসলিম লীগকে দায়ী করে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই 'হিন্দু জাতি' ধারণার উদ্ভব হয়। 'হিন্দু' শব্দটা 'জাতি' শব্দের সমার্থক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এই হিন্দুত্বের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন সাভারকার। তিনি 'হিন্দু' শব্দকে ডিফাইন করেন এভাবে—

> 'He who considers India as both his Fatherland and Holyland.'
> 'ভারতকে পবিত্রভূমি এবং পিতৃভূমি হিসেবে যারা বিবেচনা করে, তারাই হিন্দু জাতি।'

Koenraad তাঁর *Decolonizing the Hindu mind* বইয়ে লিখেছেন, এই সংজ্ঞা সকল আব্রাহামিক ধর্ম যেমন—মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদিদের হিন্দু জাতিসত্তার বাইরে ঠেলে দিলো। ধরে নেওয়া হলো—তাঁরা বিদেশি। এই হিন্দু জাতি গঠনের বাইরে যাদের রাখা হলো, তাদের তো সাভারকারই আলাদা আরেকটা জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হিন্দু জাতির ধারণা প্রতিষ্ঠা করার ফলেই ভারতে তার পালটা একাধিক জাতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠল।

এই হিন্দুত্বের জাতিকল্পনাই মারাত্মক দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার জন্ম দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম ও জাতি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে নেপাল নামক তো কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। নেপাল হিন্দুপ্রধান একটা দেশ, কিন্তু ভারত নয়। তাহলে নেপাল তো কোনোভাবেই নিজেকে হিন্দু পরিচয় দেওয়ার জন্য

https://nagorikpathagar.org

ভারতকে পিতৃভূমি কিংবা পবিত্রভূমি ভাবতে পারে না। ভারতের সাথে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র নেপালের সমস্যার একটা ঐতিহাসিক সূত্র এখানেও থাকতে পারে। যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের সাথে মিলিতভাবে রাষ্ট্র গঠন—এটা হিন্দুত্বের সংজ্ঞার জন্য কার্যত মানসিকভাবে খুব জটিল হয়ে যায়। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভারতরাষ্ট্র একটা সম্ভাবনা হয়ে বিরাজ করতে থাকে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মূল বক্তব্য ছিল—পৃথিবীতে হিন্দু জাতি বলে বহু প্রাচীন, গরিমায় দীপ্ত এক মহান স্বতন্ত্র জাতি আছে। হিন্দু জাতির ধর্ম যেমন স্বতন্ত্র, তেমন ভাষাও স্বতন্ত্র। হিন্দু জাতি সম্পর্কিত এই ভাবনাই হিন্দুত্বের জন্ম দেয়, যার পলিটিক্যাল এক্সপ্রেশন ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব, আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় ভারত ভাগের কারণ। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড।

এদিকে আমরা যদি দেখি—মুসলমানদের আলীগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৩ সালে বলেছেন, ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষে বসবাসরত সকলেই 'একটি জাতি'। এমনকী ভারত ভাগের অনেক পরও জিন্নার মুখে ছিল ঐক্যের সুর। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি বলেন—

> 'We are all sons of this land. We have to live together.... Belive me, there is no progress for India until the Musolmans and Hindus are united.'
>
> 'আমরা সকলেই এই মাটির সন্তান। আমাদের একসাথেই বাঁচতে হবে। বিশ্বাস করুন, ভারতের কোনো অগ্রগতি হবে না, যদি হিন্দু আর মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ না হয়।'

১৯৩৭ সালে আহমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার ১৯তম অধিবেশনে সাভারকার বলেন—

> 'There are two antagonistic nations living side by side in Indin.' India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogenous nation. On the contrary, there are two nations in the main: the Hindus and the Muslims, in India....several infantile politicians commit the serious mistake in supposing that India is already welded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so.'

https://nagorikpathagar.org

'দুটি পরস্পরবিরোধী জাতি ভারতে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, ভারতকে কখনোই একশিলা সমস্বত্ব জাতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না; বরং উলটোভাবে ভারতে প্রধানত দুটি জাতি—হিন্দু ও মুসলমান। কিছু বালকসুলভ রাজনীতিবিদরা এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, ভারত এর মধ্যেই সুসমস্বত্ব একটি জাতি হিসেবে তৈরি হয়েছে বা তৈরি করা যেতে পারে।'

এই সভার প্রায় ১৭ বছর আগেই *Essentials of Hindutva* নামে সাভারকারের একটা পুস্তকে দ্বিজাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করা হয় এবং হিন্দুদের একটি একক জাতি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই সভার তিন বছর পরে লাহোর অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভায় জিন্নাহ ও সাভারকার উত্থাপিত হিন্দু মহাসভার দ্বিজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করেন।

ঘটনার পরম্পরা বিবেচনা করলে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে দ্বিতীয় অবদান ভারতীয় মুসলমানদের। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি তৈরি করে দেন সাভারকার তার হিন্দু জাতির তত্ত্ব দিয়ে।

নেহেরু তাঁর অটোবায়োগ্রাফিতে লিখেছেন—

'Socially speaking, the revival of Indian Nationalism in 1907 was definitely reactionary.'
'সামাজিকভাবে বলতে গেলে ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল।'

হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদের চর্চাই মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার; যিনি কোনোভাবেই মুসলমানপ্রেমী ছিলেন না, তিনিও *Struggle for Freedom* বইয়ে লিখেছেন—

'The outburst of Hindu Mohasova served to strengthen the power and influence of Muslim League.'
'হিন্দু মহাসভার বিস্ফোরণই মুসলিম লীগের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।'

দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক জিন্নাহ নয়; হিন্দুত্ববাদী সাভারকার। অথচ কী আশ্চর্য! ভারত ও বাংলাদেশের সেক্যুলাররা এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম দেওয়ার জন্য জিন্নাহ আর মুসলিম লীগকেই সব সময় তুলাধুনা করে। অথচ গল্পটা অন্যরকম।

https://nagorikpathagar.org

ইতিহাসের সত্য একদিন তার গা থেকে ধুলোকালি সরিয়ে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে। আর সেদিন কে সাধুবেশে শয়তান হয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে—সেটাও দেখবে পৃথিবী।

ভারত ভাগের দায় কি মুসলমানদের আর জিন্নাহর

মুসলমানরা বা জিন্নাহ কখনোই প্রথম দিকে ভারত ভাগ চায়নি। চেয়েছে কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রাই। গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন ১৯২২ সালে প্রত্যাহার করার পরে কলকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লি এসব স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর এক নিদারুণ সাম্প্রদায়িক অধ্যায় শুরু হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী অহিংস গণ-আইন অমান্য করা আন্দোলনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'গান্ধি যুগ'-এর সূত্রপাত ঘটায়।

এই দাঙ্গার তরঙ্গে সবচেয়ে বীভৎস দাঙ্গা ছিল কোহটের দাঙ্গা। জনৈক হিন্দু ইসলাম ধর্মকে ব্যঙ্গ করে পদ্যাকারে একটা পুস্তিকা লিখেন। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহট শহরের সনাতন ধর্মসভার সম্পাদক জীবন দাস। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, শত শত বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়।

কংগ্রেস থেকে লালা লাজপত রাইকে এই দাঙ্গার বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনেই লালা লাজপত রাই ভারত ভাগ করে হিন্দুপ্রধান আর মুসলিমপ্রধান দুটো দেশ সৃষ্টির প্রস্তাব করেন এবং ভারত ভাগই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও হিংসার যথার্থ সমাধান বলে উল্লেখ করেন।

লাজপত রাইয়ের ভারত ভাগের প্রস্তাবের পাঁচ বছর পরে কবি আল্লামা ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে ভারত ভাগের প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবই 'পাকিস্তান প্রস্তাবনা' বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সেই বিভক্ত ভারতের একাংশের নাম যে 'পাকিস্তান' হবে, সেটা তিনি তখনও বলেননি।

https://nagorikpathagar.org

১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ড প্রবাসী চৌধুরী রহমত আলী ক্যামব্রিজ থেকে *Now or Never* নামে প্রকাশিত একটা পুস্তিকায় লিখেন—

> 'এই ভূখণ্ডে শান্তি বা প্রশান্তি কোনোটাই আসবে না, যদি আমরা মুসলমানদের প্রতারণা করে একটি হিন্দুপ্রধান ফেডারেশনে ঢুকিয়ে ফেলি; যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের মঞ্জিলের প্রভু হতে না পারি, আমাদের আত্মার নেতা হতে না পারি।'

তিনিই সেই নতুন প্রস্তাবিত দেশের নাম রাখেন 'পাকিস্তান'।

সেই সময় মুসলিম লীগের নেতারা চৌধুরী রহমত আলীর পরিকল্পনাকে কাল্পনিক, অবাস্তব ও বালখিল্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রস্তাবের সাত বছর পরে ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলমান এলাকাগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) পরিকল্পনা রয়েছে, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বলেন—

১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

২. প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) গঠন করতে পারে।

৩. 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের' সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন শুরু করে।

বিশের দশক পর্যন্ত মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ ভারত ভাগের কথা ভাবতেই পারেনি; দেশভাগ চাওয়া তো দূরের কথা। তাঁরা চেয়েছিলেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ থেকে সুরক্ষা এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা। অথচ কী আশ্চর্য! ভারত ভাগের পুরো দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় জিন্নাহ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। এটা মিথ্যার বেসাতি বইকি?

https://nagorikpathagar.org

ভারতে মুসলমানদের আগমন কি আক্রমণকারী হিসেবে

প্রচলিত ইতিহাস পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে মুসলমানরা এসেছিল আক্রমণকারী হিসেবে। এই উপস্থাপনা উদ্দেশ্যমূলক। দুই-তিন হাজার বছর আগেও গ্রিক, রোমান, আরব, চৈনিকরা ভারতের দক্ষিণে বিস্তৃত জলরাশি পার হয়ে জলপথে ভারতে এসেছে। তাদের কেউ কেউ ফিরে গেছে, কেউ কেউ থেকে গিয়ে এই ভূখণ্ডের জনগণের সাথে মিশে গেছে। কুরআন নাজিল হওয়ার আগে থেকেই আরবরা 'ধাও' নামক তাঁদের তিন পাল্লার জলযানে বাণিজ্য করতে আসত। এমনকী তাঁরা বসতি স্থাপন করে থেকেও গিয়েছিল। কোচিন থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে ক্যাঙ্গানোরে ৬৮৩ সালের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আরব মুসলমানরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তবে মুসলমানরা কীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল, কবে থেকে তারা ভারতে আসতে শুরু করে– তা ইতিহাসের বইগুলোতে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের বইয়ে ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস বলা শুরু হয় মুসলমানদের আক্রমণ করার বর্ণনা দিয়ে; যেন এর আগে ভারতে তাদের কোনো ইতিহাস নেই।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীলংকা থেকে চীন যাওয়ার পথে ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে নেমে হবংক বা বর্তমানের সিলেটে শাহ জালালের সাথে দেখা করতে যান। তখন তিনি চট্টগ্রামে অনেক মুসলমানের কবর দেখেছিলেন, যারা সেই অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। বাংলায় যদিও তখন ফকরুদ্দিন মুবারক শাহের আমল, কিন্তু তখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম মুসলিম শাসকের অধীনে ছিল না। চট্টগ্রামে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগেই সেখানে মুসলমান বসতি স্থাপিত হয়েছিল।

'শেখ সুভোদয়া' নামে এক প্রাচীন পুথি পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বখতিয়ারের গৌড় জয়ের আগে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এক আরব সওদাগর এসেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি; এসেছিলেন বাণিজ্য করতে।

ভারতের ইতিহাসের বইগুলোতে মুহম্মাদ ইবনে কাশিমের ৭১২ সালে সিন্ধু জয়ের কাহিনিকে ভারতে মুসলামান প্রবেশের প্রথম ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। বলাই বাহুল্য—এটা অর্ধসত্য। আমরা পূর্ণসত্য জানার চেষ্টা করব।

আর মুহম্মাদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের ঘটনা মোটেই রাজ্যলাভের ইচ্ছা থেকে করা হয়নি। আসল ঘটনা হচ্ছে, ভারত সাগরে আরব বাণিজ্য জাহাজের ওপরে জলদস্যুদের হামলা রাজা দাহিরের সময়ে একটা নিত্যনৈমিত্তিক

https://nagorikpathagar.org

ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরাকের শাসক আল-হাজ্জাজ অনেকবার দাহিরকে অনুরোধ করেছিলেন এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাতেও দস্যুতা থামে না; বরং এবার জলদস্যুরা বাণিজ্যবহরে হামলা করে আরব রমণীদের লুট করে নিয়ে যায়। দাহিরের বিনা অনুমতিতে বা প্রশ্রয়ে এই হামলা চলতে পারে না এবং এটা ছিল আরব বাণিজ্যের ওপরে সিন্ধুর আক্রমণ। তাই এই আক্রমণের হাত থেকে আরব বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আল-হাজ্জাজ মুহাম্মাদ বিন কাশিমকে অনুরোধ করেন দাহিরকে আক্রমণ করতে। বাণিজ্য বহরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ন্যায়সংগত যুদ্ধকে আক্রমণকারীর আক্রমণ হিসেবে যখন উপস্থাপন করা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের একাংশের (মুসলিম) মনে গ্লানিবোধ এবং আরেক অংশের (অমুসলিম) মনে ঘৃণা জন্ম নেয়। এভাবেই শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান বিভেদ। এই বিভেদের প্রভাব অনিবার্যভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠীর ওপরেও গিয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় এক সম্প্রদায়ের দিক থেকে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবিশ্বাস আর প্রতিশোধের চিন্তা।

ইতিহাস লেখকরা কি অর্ধসত্য উপস্থাপন করে ঘৃণা উসকে দেওয়া বা ঘৃণা জাগরুক রাখার দায় অস্বীকার করতে পারেন?[১]

বাংলা ভাগে দায় কার

১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হওয়ার সাথে বাংলা ভাগ হয়েছে। সেই সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের বিবেচনায় যেটা ভালো মনে করছেন, সেটাই করছেন। এই ইতিহাসের দায় আমরা উত্তরপুরুষরা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

কিন্তু বাংলা ভাগের বিষয়টাকে একটা অতি খারাপ কাজ বলে বাম ও সেক্যুলার বয়ানে চালু আছে। সেই বয়ানের মূল ভাষ্য হচ্ছে—মুসলমানরা তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছে বলে বাংলা ভাগ হয়েছে।

কিন্তু বাংলার মুসলমান নেতারা কি বাংলা ভাগ চেয়েছে? না, চায়নি। চাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কারণ, মুসলমানরাই ছিল বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভোট নিয়ে সরকার গঠন করলে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান নেতারাই প্রধানমন্ত্রী হয়।

---

১. ভারতীয় মুসলমানদের সংকট; সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৌষ ১৮০৮, পৃষ্ঠা : ৫-৮

https://nagorikpathagar.org

বাংলা ভাগের দাবি করেছিল হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিগোষ্ঠী। কারণ, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা প্রদেশে তারা তাদের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি। সেই সময় বাংলায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলোতে যেমন—বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশপরগনা, বাকুড়া, মেদিনিপুর ও বীরভূমে বাংলা ভাগ করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। হিন্দু নেতাদের মধ্যে শরত বসু মুসলমান নেতাদের সাথে ভারত পাকিস্তানের বাইরে আলাদা বাংলা রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তিনি নিজের ধর্মের লোকদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাননি।

১৯৪৭ সালের শুরুতে বেঙ্গল আইনসভাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একভাগে থাকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর নির্বাচিত সদস্য, আর অন্যভাগে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর নির্বাচিত সদস্য। ওই একই বছরের ২০ শে জুন আইনসভার দুই অংশ আলাদাভাবে বাংলা ভাগের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ভোট দেয়। ঐতিহাসিক এই ভোটাভুটিতে আইনসভার হিন্দু অঞ্চলের অধিকাংশ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেয়। আর মুসলমান অংশ নিরঙ্কুশভাবে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে ভোট দেয়। সেদিনই বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়।

কিন্তু বাংলা ভাগের দায় কেন বাম আর সেক্যুলাররা মুসলমান নেতাদের দেয়, সেই প্রশ্ন তাদের করা উচিত। তাদের কাছে কি কোনো উত্তর আছে?

ভারত ভাগের দায় কি মুসলিম লীগের

ভারত ভাগের দায় এবং সেই বিভাগজনিত কারণে কোটি মানুষের দেশত্যাগ আর রক্তপাতের দায় কংগ্রেস ও সেক্যুলার ইতিহাসবিদরা একতরফাভাবে মুসলিম লীগের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের 'ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব' এবং তৎপরবর্তী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া এই বিষয়টি নির্মোহভাবে পর্যালোচনায় সাহায্য করবে।

আগে জেনে নিই—'ক্যাবিনেটি মিশন প্রস্তাব' কী ছিল?

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর একটি মিশনকে উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্বসম্মত উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রেরণ করেন। এই তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এভি আলেকজান্ডার। স্টাফোর্ড ক্রিপস এই মিশনে নেতৃত্ব দেন।

https://nagorikpathagar.org

ক্যাবিনেট মিশন এমন কিছু পরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করেন, যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করবে। ১৯৪৬ সালের ১৬ মে তাদের পরিকল্পনা পেশ করে। পরিকল্পনার প্রধান তিনটি ধারা ছিল—

১. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতি দশ লাখ ভোটার থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি কেন্দ্রীয় গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য সংবিধান রচনা করবে।

২. ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। এই সরকারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পাঁচটি করে এবং শিখ ও তফসিলিদের একটি করে মন্ত্রিত্ব থাকবে।

৩. প্রদেশগুলো তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হবে। বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি গ্রুপ। পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিমপ্রধান এলাকা নিয়ে আরেকটি গ্রুপ। অবশিষ্ট প্রদেশগুলো নিয়ে আরও একটি গ্রুপ। প্রত্যেকটি গ্রুপ তার নিজের সংবিধান রচনা করার অধিকার পাবে এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগব্যবস্থা ছাড়া বাকি সব বিষয়ে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। প্রত্যেক গ্রুপ আবার ১০ বছর পর সংবিধানের পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবে এবং চাইলে পৃথকও হয়ে যেতে পারবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে ভারত ভাগের কথা ছিল। এই প্রস্তাব মানলে কিছুদিন অন্তত একসাথে থেকে তারপর ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই প্রস্তাব পেশ হওয়ার ২০ দিনের মধ্যে ৬ জুন সম্পূর্ণভাবে প্রথম মেনে নেয় মুসলিম লীগ। এর একমাস পরে ৬ জুলাই কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি দেয়। আবার ১০ জুলাই কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নেহেরু এই প্রস্তাব কার্যত প্রত্যাখ্যান করেন। নেহেরুর প্রতিক্রিয়ায় জিন্নাহ ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়ে ২৯ জুলাই আগের দেওয়া স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অসীম রায় লিখেছেন—

> 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় দেশ-বিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী মিশন (ক্যাবিনেট)-পরিকল্পনা হত্যার আসামি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।'

অথচ কী আশ্চর্য! এই স্বার্থবাজ কংগ্রেস আর চতুর নেহেরু সেক্যুলার ইতিহাসে মহান হিসেবে চিহ্নিত।

https://nagorikpathagar.org

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান

ব্রিটিশ শাসন অবসানে মুসলমানদের লড়াই

কলকাতাবাসী একজন স্যোশাল মিডিয়া একটিভিস্ট-এর একটি লেখা দৃষ্টিগোচর হলো। লেখার মূল বক্তব্য ব্রিটিশদেরকে ভারতের হিন্দুরা একাই তাড়িয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানদের ডেকেছিল, কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদের ডাক শুনে এই লড়াইয়ে যোগ দেয়নি। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো মুসলমান শহিদ হয়নি।

বড়োই কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস চর্চা। তাদের কাছে তিতুমির, নুরুলদিনও শহিদ নন, শহিদ নন সিপাহি বিদ্রোহের মুসলিম শহিদরাও।

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ রক্তাক্ত সামরিক যুদ্ধ এবং কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। এই রক্তাক্ত বিদ্রোহগুলো ব্রিটিশরাজকে এতই ভীত করেছিল যে, ভাইসরয় লর্ড মেয়ো প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভারতীয় মুসলমান কি তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য?'

উইলিয়াম হান্টার নামের এক ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার মুসলমানদের সাথে ব্রিটিশদের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কারণ অনুসন্ধান করে একটা বই লিখেছিলেন। নাম—*The Indian Musalmans*.

একটা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিধর্মী রাজশক্তির কাছে সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর তাদের ক্রোধ, অভিমান ও অভ্যুত্থানের লড়াইকে কীভাবে সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কৌশলে দমন করা হয়েছিল, সেটার একটা অসাধারণ দলিল এই বইটি।

https://nagorikpathagar.org

একটা খুব মজার অংশ আছে সোয়াত অঞ্চলে বিদ্রোহ সম্পর্কে। এই সোয়াত উপত্যকা যে সেই সুদূর ব্রিটিশ আমল থেকেই শাসকদের মাথাব্যথা ছিল, সেটা জেনে আমোদিত হয়েছি। তিনি সোয়াত সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'সোয়াত অঞ্চলের আধ্যাত্মিক রাজ্য, যাকে সোয়াতের মুসলমান ধর্মীয় এলাকা বলে অভিহিত করা যায়, তার মধ্যে ৯৬ হাজার লোকের বাস। এদের প্রত্যেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রিটিশ আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই বড়ো হয়েছে এবং এই ভাবনা তাদের মধ্যে জন্মের পর থেকেই প্রোথিত যে, বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে একজন ধর্মগুরু থাকা ভালো, যে ধর্মগুরুর পতাকাতলে মৃত্যুবরণ করলে শহিদ হওয়ার আনন্দ লাভ করা যাবে। আমরা ১৮৬৩ সনের অভিযানে অনেক মূল্য দিয়ে শিখেছিলাম যে, ধর্মান্ধ শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযানের অর্থ, পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী জনগোষ্ঠীসমূহের তিপান্ন হাজার লড়াকু লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা।'

সেই সময়েও সোয়াতের মানুষের সাথে লড়াই করতে গেলে ব্রিটিশ শক্তির রক্ত হিম হয়ে আসত সেটা পরিষ্কার।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান

আপনি আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দেখেন, মনে হবে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে। আপনি দেখবেন, যারা জেল খেটেছেন, তাদের মধ্যে নাম আছে গান্ধি, নেহেরু, মতিলাল, সুভাষ বোস, কৃষ্ণ মেনন, সরোজিনি নাইডু, অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের। যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, ভগত সিং, প্রীতিলতা ও সূর্যসেন। সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে নাম আছে অনুশীলন আর যুগান্তরের। ইতিহাসে যাদের নাম উল্লেখ আছে, অবশ্যই তারা আমাদের সম্মানীয়। কিন্তু এই তালিকায় কোথাও কোনো মুসলমানের নাম নেই কেন? মুসলমানরা কি সেই লড়াইয়ে ছিল না? অবশ্যই ছিল। তাহলে তাদের নাম নেই কেন? কারণ, সেগুলো সযতনে মুছে ফেলা হয়েছে।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই একশো নব্বই বছরে হাজার হাজার মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন। কোলকাতা সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর শ্রী শান্তিময় রায়কে এক প্রবীণ কংগ্রেসি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা ছিল বৈরী।' এই ঘটনা শান্তিময় রায়কে বিচলিত করে। তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান নামে এক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে উঠে আসে সব বীরত্বের কথা, যা চেপে রাখা হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

কয়েকটা লেখা এখানে উল্লেখ করছি—

> 'হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন সর্বভারতের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। সেই সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক। দিল্লির বাইরে গেলে ফি নিতেন সেই সময়ে এক হাজার টাকা। গরিবদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নিতেন না। কংগ্রেস নেতা হিসেবে জেল খেটেছেন বহু বছর। নেহেরুর চেয়ে কম না। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নামটাও ভারতের ইতিহাসে নেই। এমনকী মওলানা আজাদ যে জেল খেটেছিলেন, সেই ইতিহাসও নেই।'

খাজা আব্দুল মজিদ ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। নেহেরুর সমসাময়িক কংগ্রেস নেতা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনই জেল খেটেছেন বহু বছর। কোথাও এর উল্লেখ নেই।

নেতাজি সুভাষ বসুর ডান হাত ও বাম হাতের মতো ছিলেন আবিদ হাসান এবং শাহেনেওয়াজ খান। তাদের নাম কি আছে কোথাও? নেতাজির রাজনৈতিক সংগ্রামে আর আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন—আজিজ আহমেদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড কিয়ানি, ডিএম খান, আব্দুল করিম গনি, কর্নেল জিলানি। ইতিহাসে কারও নাম নেই।

অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের যে ম্যাসাকারের কথা আমরা জানি, সেটা কার গ্রেফতারের প্রতিবাদে হয়েছিল? সেটা হয়েছিল কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন কিচলুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে। তিনি ছিলেন অতি জনপ্রিয় একজন নেতা।

জনতা তাঁর গ্রেফতারের সংবাদে ফুঁসে উঠেছিল। জার্মানি থেকে ওকালতি পাস করে আসা সাইফুদ্দিন কিচলুকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম জানি, সেখানে ম্যাসাকার হয়েছিল সেটা জানি, জেনারেল ডায়েরের কথা জানি—যিনি গুলি চালানোর আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যিনি এই প্রতিবাদের প্রাণপুরুষ ছিলেন, সেই সাইফুদ্দিন কিচলুর নামও নেই। কী অদ্ভুত বিষয়!

আমরা গোপন সন্ত্রাসবাদী দল অনুশীলন যুগান্তরের কথা জানি, যেখানে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইনকিলাবি পার্টির কথা জানি না।

https://nagorikpathagar.org

তাদের নেতা ছিলেন পালোয়ান শিশু খান। পালোয়ান শিশু খান ইংরেজ বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। শিশু খান ইতিহাসে কোথাও নেই।

ক্ষুদিরাম কিং স্ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিং স্ফোর্ডের বদলে ভুলবশত দুজন ইংরেজ নারী নিহত হয়। ক্ষুদিরাম আমাদের কাছে বীর। কিন্তু মুহম্মাদ আব্দুল্লাহ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরম্যানকে একাই কোর্টের সিঁড়িতে অসম সাহসে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেন ১৭৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। এই নরম্যান অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। মুহম্মাদ আব্দুল্লাহ ইতিহাসে স্থান পাননি।

বীর বিপ্লবী শের আলির কথা না বললে অবিচার হয়ে যাবে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জন্য তাঁর ১৪ বছর জেল হয়। শের আলি আন্দামানে জেল খাটছিলেন। এমন সময় কুখ্যাত লর্ড মেয়ো আন্দামান সেলুলার জেল পরিদর্শনে আসে। শের আলি সুযোগ বুঝে বাঘের মতোই রক্ষীদের পরাস্ত করে তার ওপর চাকু হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লর্ড মেয়ো আন্দামান জেলেই শের আলির চাকুর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।

শের আলির দ্বিতীয়বার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে ফাঁসির রায় হয়। শের আলি বীরের মতো শহিদি মৃত্যু বরণ করেন ফাঁসির কাষ্ঠে। অথচ কী আশ্চর্য! শের আলির স্থান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

ভারতবর্ষ ও মুসলমান : প্রচারিত ভুল ধারণা

পর্দা বা অবরোধ প্রথা

ভারতবর্ষে মুসলমানরা আসার অনেক আগেই পর্দা বা অবরোধ প্রথা ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজের সাথে মেয়েদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা গৃহবন্দিত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে 'অবরোধবাসিনী' ও 'অসূর্যম্পর্শা' শব্দ দুটো পাওয়া যায়। রামায়ণে সীতা রামের সঙ্গে বনে যাওয়ার সময় বিলাপ করে বলছে—'যার মুখ কেউ কখনো দেখেনি, তিনি আজ পায়ে হেঁটে বনে যাচ্ছেন।'

জাতকের কয়েকটি গল্পে পাওয়া যায়—রাজমহিষীরা আচ্ছাদিত চতুর্দোলায় চড়ে রাজপথে বের হয়েছেন। প্রাচীন ভারতে অবরোধ হয়ে উঠেছিল অভিজাত ভারতের যৌন শুচিতার লক্ষণ। 'মৃচ্ছকটিকে' গণিকা বসন্তসেনা যখন কুলবধূর মর্যাদা পায়, তখন অবরোধের চিহ্ন হিসেবে তাঁর মুখ ঢাকা পড়ে ঘোমটায়। আবার 'ললিতবিস্তারে' বুদ্ধের বাগদত্তা গোপা পর্দা আরোপিত শুচিতা উপেক্ষা করে বলছিলেন—

'স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমার মুখ ঢাকার কোনো দরকার নেই।'

মেয়েদের পর্দা শুধু আরবের সংস্কৃতিই নয়; প্রাচীন ভারতেরও বটে। আর এই সংস্কৃতির উদ্ভবের সাথে ধর্ম নয়; বরং যুক্ত আছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস।[২]

---

[২]. The Position of Women in Hindu Civilization, from Prehistoric Times to the Present Day, Anant Sadashiv Altekar; সুকুমারী ভট্টাচার্য, দ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস; প্রাচীন ভারতে নারী, রত্নাবলি চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতা ভট্টাচার্য।

https://nagorikpathagar.org

মুসলমানরা কি হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছে

এক বিখ্যাত নাস্তিক লিখেছেন, ভারতে নাকি মুসলমান শাসকেরা হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছেন, মন্দির অপবিত্র করেছেন। সেটার নাকি অনেক একাডেমিক রেফারেন্স আছে; যদিও সেই রেফারেন্স দেওয়ার দায় তিনি বোধ করেননি।

কথা হচ্ছে, একজন নাস্তিকের মাথাব্যথা কি এটা হওয়া উচিত যে, মন্দির ভাঙা হয়েছে, মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে? তারা তো মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং প্যাগোডায় তালা লাগাতে চায়। তারা চায়—কেউ যেন ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবানের নাম না নিক। মন্দিরের বিষয়ে তার এই বিশেষ বদান্যতার কারণ বুঝলাম না।

তবে এটা একদম মিথ্যা কথা যে, ভারতে মুসলমান শাসকরা ধর্মীয় বিদ্বেষবশত হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছেন।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম ইটন জানাচ্ছেন, ১২ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত পুরো মুসলিম শাসনে দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমান শাসকদের হাতে মোট ৮০টি মন্দির ভাঙা হয়েছিল। এবার নিশ্চয় সেই নাস্তিক লাফিয়ে উঠবেন, এই তো ভাঙা হয়েছিল। কেন ভাঙা হয়েছিল, সেটার কারণও রিচার্ড ইটন অনুসন্ধান করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন—যেই সমস্ত রাজা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং সেই বিদ্রোহে যদি কোনো মন্দির বিদ্রোহী রাজার সাথে পলিটিক্যালি যুক্ত থাকত, সেই মন্দির মুসলমান শাসকরা ধ্বংস করেছেন। কারণটা পুরোপুরি রাজনৈতিক; ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও মন্দির ধ্বংসের অপবাদ শোনা যায়। এখানেও বিস্ময়করভাবে কারণটা রাজনৈতিক। আওরঙ্গজেব রাজপুতদের মেহনত মন্দির ভেঙেছিলেন, যেই রাজপুত মোঘলদের অনুগত ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহ দমনের পর মন্দিরগুলো ভাঙা হয়।

বাংলা সম্পর্কে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিচ্ছেন ইটন। তিনি জানাচ্ছেন, বাংলায় সম্রাট আওরঙ্গজেব যেকোনো মোঘল শাসকদের চেয়ে বেশি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেবের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষের দোষটা আরোপিত যেটা তাঁর প্রাপ্য নয়।

https://nagorikpathagar.org

এ পি জে আবদুল কালাম কেন ইফতার পার্টি দিতেন না

প্রথম আলোর মিজানুর রহমান 'এ পি জে আব্দুল কালাম কেন ইফতার পার্টি দিতেন না!' শিরোনামে একটা কলাম লিখেছেন। পাঁচটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের লেখা পড়লেও আপনি বুঝবেন না কেন এ পি জে আব্দুল কালাম ইফতার পার্টি দিতেন না? আরও আশ্চর্য হচ্ছে, এই পাঁচটা পয়েন্টে আব্দুল কালামের কয়েকটা বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য তুলে ধরলেও মিজানুর রহমান শিরোনাম করলেন ইফতারি নিয়ে। ভাবখানা এমন—দেখ, একজন মুসলিম প্রেসিডেন্ট হয়েও কিন্তু তিনি ইফতার বন্ধ করে দিলেন। এই ভাবটাই আসলে উসকানিমূলক। যেন তিনি এটা একটা 'সেক্যুলার অ্যাক্ট' করেছেন, তাই এটা খবর!

মিজানুর রহমান যদি আরেকটু কষ্ট করতেন, তাহলে এই ইফতার কেন তিনি করাননি, তার একটা উত্তর পেতেন। কারণ, পত্রিকাতে এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অফিসের একটা বিবৃতি গিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল—

> 'The month of Ramzan has a special significance as the Quran Sharif was bestowed as guidance to humanity during this period. During this month, fasting with prayers is observed, Namaaz-e-Taraveeh (special prayers) are held and charity is done.'
>
> 'রমজান মাসের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ, এই মাসেই মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কুরআন শরিফ নাজিল হয়েছিল। এই মাসে রোজার সাথে সাথে মোনাজাতও করা হয়। নামাজে তারাবি (বিশেষ নামাজ) পড়া হয়, হিতৈষিতা (পরোপকার) আচরিত হয়।'

রাষ্ট্রপতির দপ্তর রমজানের এই যে থিওলজিক্যাল ডোমেইন, এর মধ্য থেকেই তাঁর চ্যারিটির জন্য ইফতারের অর্থ বরাদ্দ করতেন। এর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত অনুদান যুক্ত করে দুঃস্থদের সাহায্যে ব্রত পালন করা হয়েছে। সেটা রাষ্ট্রপতির দপ্তরের বিবৃতিতে স্পষ্টভাবেই বলা ছিল—

> 'So that the poor and the needy are helped during this holy month.'
>
> 'যেন দরিদ্র আর দুঃস্থরা এই পবিত্র মাসে সহায়তা পায়।'

প্রথম কথা হলো, 'ইফতার পার্টি' দেওয়া কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান (Religious ritual) নয়। অবশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রপতিরা সাধারণত যেসব রাষ্ট্রাচার অনুসরণ করে থাকেন,

https://nagorikpathagar.org

এটা তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রাষ্ট্রাচার বটে। তবে এটা কোনো অবশ্য করণীয় ব্যাপার নয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ইফতার পার্টি না দেওয়া কোনো রিলিজিয়াস রিচুয়াল ত্যাগ করাও নয়।

এ ছাড়া সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, তিনি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ আকাঙ্ক্ষা (Secular aspiration) থেকে ইফতার বন্ধ করেননি; বরং ঘোরতরভাবে ইসলামের মৌলিক কিছু বিধান ও নির্দেশ মোতাবেক আচরণ করেছেন। আর সেটা রাষ্ট্রের এবং নিজের ব্যক্তিগত তরফে রাষ্ট্রকে প্রমাণ রেখে এ কাজে টেনে নিয়ে এসেছেন। তাই বাংলার সেক্যুলারদের এত আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই।

শহিদ তিতুমির কি রেইসিস্ট

শহিদ তিতুমিরকে রেইসিস্ট ইতিহাসবিদরা হিন্দুবিদ্বেষী বলে প্রচার চালিয়েছে। অথচ তিতুমির, হাজি শরিয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া ছিলেন মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে অসামান্য বীর। বামপন্থিরা যাকে শ্রেণি-সংগ্রাম বলে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সেই শ্রেণি-সংগ্রামী। ধর্মীয় দিক থেকে নয়; রাজনীতির দিক থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন 'রেড রিপাবলিকান' বা 'কমিউনিস্ট'। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ইসলাম-বিদ্বেষীদের খপ্পরে পড়ে যাওয়ায় এই মহান শ্রেণি-সংগ্রামীরা বামদের আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেনি। তাদের একাট্টা ইসলাম বিরোধিতা আপামর মানুষকে কমিউনিস্টবিরোধী করে তৈরি করেছে। তাই তাদের লড়াইকে কমিউনিস্ট লড়াই অথবা শ্রেণি-সংগ্রামের লড়াই বলে প্রচার করলে ওয়াহাবি, ফারায়েজি আন্দোলনের ঐতিহ্য ধারণকারীরাও নারাজ হয়। আমাদের নির্মোহভাবে এই গৌরবের লড়াইগুলোকে আজকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ, এই ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে।

তিতুমির যেই বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন, তার বেশিরভাগের বক্তব্য ছিল হিন্দু-কৃষকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদার আর নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তিতুমিরের লড়াইয়ের সময় সরফরাজপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের হরিজন আর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়।

https://nagorikpathagar.org

তিতুমির বিবাদ মেটাতে সেখানে যান এবং একটা বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো—

> 'ইসলাম শান্তির ধর্ম। যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের সহিত কেবল ধর্মের ব্যবধানের জন্য অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল পছন্দ করেন না; বরং আল্লাহর প্রিয় রসূল এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন, কোনো প্রবল শক্তিসম্পন্ন মুসলমান যদি দুর্বল অমুসলমানকে তাহার ন্যায়সংগত দাবি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি অন্যায়, জুলুম ও অবিচার করে; মুসলমানরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করিতে বাধ্য।'

তিতুমির সম্বন্ধে বাংলার ব্রিটিশপন্থিদের মূল্যায়ন—

> 'হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিষ্টান হউক, শিখ হউক, পারসিক হউক, তিতুর ন্যায় কখনো কারোর দুর্বুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিতই তাহার চৈতন্য হইবে। তিতুর বড়ো দুর্বুদ্ধি। তাই তিতু বুঝিল না ইংরেজ কত ক্ষমাশীল, কত করুণাময়! দুর্বুদ্ধি তিতু ইংরেজদের সে করুণা, সে মমতা বুঝিল না এই ভারতে ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজদের করুণার মর্ম, ইংরেজের বাৎসল্যেরভাব কে না বুঝে, ইংরেজের রাজত্বে সুখামৃতের নিত্যসুখস্বাদ কে না করে!'[৩]

---

৩. ওয়াহাবি থেকে খিলাফত : একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অধ্যায়; ড শ্যামাপ্রসাদ বসু, নবজাতক প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

https://nagorikpathagar.org

মাদরাসা প্রসঙ্গ

মাদরাসা ছাত্ররা কি বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়

বাংলাদেশের সেক্যুলারদের জনপ্রিয় বয়ান—'মাদরাসা ছাত্ররা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবে।' এই বয়ান শুনে প্রশ্ন জাগে—আফগানিস্তানকে আজকের আফগানিস্তান বানিয়েছে কি মাদরাসার ছাত্ররা, নাকি আমেরিকা? ইরাককে আজকের ইরাক বানিয়েছে কে? মাদরাসার ছাত্র, নাকি আমেরিকা? আমেরিকা কেন আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে দখল করে সেখানে তাবেদার সরকার বসায়? বসায় এই কারণে যে, কাস্পিয়ান সাগরে ২০০ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুত আছে। সেই তেল তাকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে পাকিস্তান হয়ে ভারত মহাসাগরে নিতে হবে। এই রিজার্ভ মধ্যপ্রাচ্যের রিজার্ভের এক-তৃতীয়াংশ। তালেবানরা সেই তেলের লুটপাটে রাজি হয়নি। তাই তালেবানদের উৎখাতের প্রয়োজন হয়েছিল আমেরিকার। তাহলে আফগানিস্তানে স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে। সেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে তালেবানরা।

বামপন্থিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয়তাবাদীদের সাথে হাত মেলাতে পারে, কিন্তু ইসলামিস্টদের সাথে হাত মেলাতে পারে না কেন? তাদের লড়াইয়ের শক্তি ধর্ম—তাই? যদি তাই হয়, তবে ল্যাটিন অ্যামেরিকায় ধর্মবাদী চার্চের সাথে হাত মিলিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থিরা কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে? ধর্ম তো এখানে ঐক্যের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়নি! তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ধর্মের সঙ্গে হাত মেলানোতে বামপন্থিদের সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে ইসলামের সাথে হাত মেলানোতে। তাহলে বামপন্থিরা মুখ ফুটে বললেই পারে, তাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বড়ো শত্রু 'ইসলাম'।

https://nagorikpathagar.org

ল্যাঙ্গা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু হাইড। 'তোমারি প্রতিধ্বনি তোমারেই দিই ফিরায়ে, সেকি পশে তব স্বপ্নের পারে বিপুল অন্ধকার বাহি।'

মাদরাসায় জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল এন্থেইম রুলস ১৯৭৮ অনুসারে। এই আইন ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের ৫-এর ২ ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে, এটা স্কুলে দিনের কার্যক্রম শুরুর আগে গাইতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়। আইনে স্পষ্টভাবে 'স্কুল' উল্লেখ করা আছে। এই আইন অনুসারেই মাদরাসায় জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, এই আইনে মাদরাসার কথা উল্লেখ নেই। মাদরাসা মানে স্কুল নয়। এর ওপর আবার মাদরাসা বলতে সরকারি পরিভাষায় আলিয়া মাদরাসা বোঝানো হয়। আর কওমি—এটা কওম বা কমিউনিটি উদ্যোগের বেসরকারি অর্থে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া কওমি প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত কমিউনিটির থিওলজিক্যাল (ধর্মতত্ত্ব) চর্চার প্রতিষ্ঠান। কওমি ছাত্রের জীবন ও শিক্ষাপদ্ধতি স্কুলের মতো নয়। তাঁরা রাত দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। ফজরের দেড়-দুই ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়ার পর প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কিতাব পড়ে। এরপরে ফজরের নামাজ শেষে কুরআন তিলাওয়াত করে। এই হচ্ছে তাদের দিনের শুরু। ফলে প্রচলিত স্কুল বলতে যে ধারণা, কওমি মাদরাসা তা থেকে অনেক দূরে। আরেকভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানমাত্রই সেখানে জাতীয় সংগীত গাইতে হবে—আইনটা তেমন অর্থ বহন করে না। ঠিক যেমন কোনো প্রাইভেট কোম্পানি সকালে কাজের শুরুতে জাতীয় সংগীত গায় কি না, এটা কোনো প্রশ্ন হলো না।

আইনের সেই ধারায় লেখা আছে—

> 'In all schools, the day's work shall begin with the singing of the National Anthem.'
>
> এর অর্থ– 'সকল স্কুলের দিনের কার্যক্রম শুরু হবে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে। এটা প্রত্যেকদিন গাইতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)-এর মহাপরিচালক প্রাথমিক স্কুলগুলোতে নয় (০৯) ধরনের নির্দেশনামূলক বার্তা পাঠিয়েছেন। সেখানে বলা আছে—

https://nagorikpathagar.org

'জাতীয় সংগীত গাইতে হবে।' তার মানে কি এই—প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যে স্কুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা জাতীয় সংগীত গায় না? ঠিক তা নয়। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য, ২০১৬ সালে এডুকেশন ওয়াচের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বাংলাদেশের ২৩% প্রাথমিক স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। সেজন্য হয়তো তিনি এ নির্দেশ জারি করেছেন।

ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে কি প্রত্যেকদিন জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়? না, হয় না। দুই দিন গাওয়া হয়। এটা বেআইনি এবং সরাসরি আইন অমান্য করা।

আমাদের সময়ে ক্যাডেট কলেজগুলোতে একদিন জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো, যেদিন প্রিন্সিপ্যালস অ্যাসেম্বলি হতো। এখন কী হয়, সেটা এখনকার অভিভাবকরা বলতে পারবেন। এখানেও আইন অনুসারে প্রত্যেকদিন গাওয়া হচ্ছে না। আইন অমান্য হচ্ছে। অন্তত আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, তখন হয়েছে এটা নিশ্চিত। আইনটা হয়েছে আমরা যখন স্কুলের ছাত্র তখন।

বাংলাদেশের সেক্যুলারেরা মাদরাসায় কেন জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না, তা নিয়ে শোরগোল করছেন। অথচ নিজের যা করা আইনগত বাধ্যতা আছে, সেটা পালন করেন না। তাদের প্রমাণ করা উচিত, আইন অনুসারে মাদরাসায় জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক।

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জাতীয় সংগীত গাওয়া অর্থ হলো রাষ্ট্রকে সম্মান দেখানো। কিন্তু অনেক জাতীয়তাবাদী এর অর্থ এমন করছেন যে—তাহলে যে জাতীয় সংগীত গায় না, সে রাষ্ট্রকে অসম্মান করছে। এখানে কথাটা এমন হলো যেন বলা হচ্ছে, যা সাদা নয়, তা নিশ্চয় কালো! সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠানই জাতীয় সংগীত গায় না। এর মানে এই নয় যে, এগুলো রাষ্ট্রকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে করা হয়। পশ্চিমা পৃথিবীর অনেক দেশেই স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। তার মানে এই নয় যে, তাদের দেশপ্রেম শিক্ষা সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

আর মনে রাখা উচিত, সবকিছুকে ইউনিফর্ম অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের বাইরে কোনো কিছুই চর্চা করতে দেওয়া হবে না; এই চিন্তাটাই অমূলক। জাতীয়তাবাদের ভেতরে এর আড়ালে ফ্যাসিজমের আবির্ভাব সেখান থেকেই হয়।

https://nagorikpathagar.org

মাদরাসায় হিন্দু ছাত্র পড়তে পারে কি

> 'ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়িতেন। প্রত্যেক গ্রামে এজন্য টোল ও ফারসি শেখার জন্য মাদরাসা বা মোক্তব ছিল। অনেক সময় এসকল মাদরাসা গ্রামের মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকিত। মসজিদের ইমাম বা অন্য কোনো মৌলভি শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চ শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান বালকেরা এসকল মাদরাসায় একসঙ্গে শিক্ষালাভ করিত। এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ছিল না। হিন্দু বালকেরাও মুসলমান মৌলভিকে শিক্ষাগুরুর প্রাপ্য মর্যাদা ও ভক্তি অসঙ্কোচে অর্পণ করিত। হিন্দুরা যেমন নিজেদের বিদ্যারাম্ভে বা হাতেখড়ির সময়ে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া লিখিতে-পড়িতে আরম্ভ করিত, সেইরূপ মাদরাসায় বা মোক্তবে যাইয়া ফারসি পড়িতে আরম্ভ করিবার সময় এবং প্রতিদিন পাঠের প্রারম্ভে কোরআনের আদি কথার 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' আবৃতি করিত। ইহার ফলে তখনকার মধ্যশ্রেণির হিন্দু ভদ্রলোকদের অন্তরে মুসলিম ধর্মের প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা জন্মিত।'[৪]

বিপিন পাল হচ্ছেন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রজন্মের নেতা। যে তিনজন নেতা কংগ্রেসের ভিত তৈরি করেছিলেন, তাঁরা হলেন– লালা লাজপত, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন পাল। এই তিন ট্রায়োকে একসঙ্গে বলা হতো লাল-বাল-পাল। বিপিন পাল ছিলেন আমাদের হবিগঞ্জের ছেলে।

বিপিন পাল নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের সন্তান। মাদরাসায় পড়তে তার কোনো সমস্যা হয়নি, এমনকী 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' বলে প্রতিদিনের পাঠ শুরু করতেও সমস্যা হয়নি। তিনি ভিন্নধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির উপায় হিসেবে তার মাদরাসা শিক্ষার কথাটি উল্লেখ করেছিলেন। আজকের বাস্তবতায় বিপিন পালের কথা আমাদের কাছে গালগল্প মনে হবে। তাহলে আমরা এগিয়েছি নাকি পিছিয়েছি? সেক্যুলাররা যে মাঝে মাঝে ১৪০০ বছর পিছিয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়, ওরা নিজেরাই হাজার বছর পেছনের ঘৃণার আর মূর্খতার জগতে বাস করছে।

---

৪. সত্তর বছর; বিপিন চন্দ্রপাল, পৃষ্ঠা : ৩৭

https://nagorikpathagar.org

সিলেবাসকে হেফাজতিকরণ করা হয়েছে কি

সেক্যুলাররা হাহাকার করেছিল এই বলে যে, সরকারি পাঠ্যক্রমকে হেফাজতিকরণ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, হেফাজত বেছে বেছে হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

সম্ভবত সেক্যুলাররা কখনো দেখেনি, কওমি মাদরাসা নিজেরা কী বাংলা পড়ায়। কওমি মাদরাসাগুলোতে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত নিজেদের বই নিজেরাই রচনা করে এবং বেফাক সেগুলো ছাপায়। এ বইগুলো লিখেন কওমি ঘরানার বরেণ্য আলিমরাই।

আমি বেফাক থেকে কওমি মাদরাসার পাঠ্য ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাংলা বই সংগ্রহ করেছি এবং আমার বিশ্বাস সেক্যুলাররা যে বই লিখে, তার চেয়ে এগুলো অনেক ভালো।

প্রথম শ্রেণিতে তারা প্রথম যেই কবিতা পড়ে, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি', দ্বিতীয় কবিতা কাজী নজরুলের 'ভোর হলো', তৃতীয় কবিতা জসীমউদ্দিনের 'মামার বাড়ী'।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে আরও অনেক কবিতার সাথে তারা পড়ে মদনমোহন তর্কালংকারের 'আমার পণ', রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোটো নদী', রজনীকান্ত সেনের 'স্বাধীনতার সুখ', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কাজের লোক'।

তৃতীয় শ্রেণিতে কুসুমকুমারী দাশের 'কাজের ছেলে'।

চতুর্থ শ্রেণিতে কালিদাস রায়ের 'মাতৃভক্তি', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা দিদি'।

পঞ্চম শ্রেণিতে সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র', জগদীশ্চন্দ্র বসুর 'গাছের জীবন কথা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত 'উত্তম অধম'।

সেক্যুলাররা যে দাবি করেছিল, হেফাজতিকরণ মানে হিন্দুবিদ্বেষ থেকে পাঠ্যবই থেকে বেছে বেছে হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া। তাহলে তারা নিজেরা কেন তাদের লেখা পাঠ্য বইয়ে এত হিন্দু লেখকের লেখা ছাপিয়েছে? এর জবাব কী দেবেন তারা?

আনিসুজ্জামানের আত্মজীবনীর প্রথম দুই খণ্ড 'কাল নিরবধি' ও 'আমার একাত্তর' সাহিত্য রসিকের কাছে পরিচিত। তৃতীয় খণ্ডের বৃত্তান্ত শুরু যুদ্ধ শেষে লেখক যখন দেশে ফিরছেন। রাস্তায় ভাঙা রেলসেতু, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত বাঙ্কার।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু যুদ্ধজয়ই শেষ নয়; তারপরই আসল কাজ হলো দেশটাকে গড়ে তোলা। সেই গড়ার প্রাক্কালে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র দাবি তুললেন, তাদের হোস্টেলে গরুর গোশত খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আনিসুজ্জামান হতভম্ব। পাকিস্তান আমলেও ছাত্ররা এহেন অন্যায় আবদার করেনি।

এই বই ব্যাক্তিজীবন ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে উপমহাদেশের সার্বিক ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের গরুর গোশত খেতে চাওয়াটা আনিসুজ্জামানের কাছে অন্যায় আবদার! আর এটা আনন্দবাজারের কাছে 'উপমহাদেশের সার্বিক ট্র্যাজেডি'!

এবার বোঝেন প্রগতিশীল ভাইয়েরা! আপনারা এত দিন প্রগতিশীলতা এবং সেক্যুলারিজমের নামে কলকাতার তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ গিলিয়েছেন। কোনো বাম সেক্যুলার প্রগতিশীল কি আনিসুজ্জামানকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ভাই, এটা কেন অন্যায় আবদার হবে? একটু বুঝিয়ে বলেন তো!'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসা ছাত্রদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মাদরাসার ছাত্রদের সাথে কী মাত্রার বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তা চিন্তারও অতীত। কোনো গণমুখী শিক্ষানীতির দাবিদাররা তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে এটা কীভাবে সম্ভব?

একজন আব্দুর রহমানের উদাহরণ দেখি—

> 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযয়ের "খ" ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল একজন মাদরাসার ছাত্র, আবদুর রহমান। প্রথম স্থান অধিকার করতে তাকে ৪২ হাজার শিক্ষার্থীকে পেছন ফেলতে হয়েছিল। এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ গোল্ডেন ফাইভ বা ফাইভ পাওয়া। যাদের মধ্যে নটরডেম, ভিকারুন্নেসা নূন, রাজউক মডেল কলেজ, হলিক্রস, আইডিয়াল কলেজ, সকল ক্যাডেট কলেজ, সকল ক্যান্টনমেন্ট কলেজসহ নামি-দামি কলেজসমূহের শিক্ষার্থীরাও আছে।'

https://nagorikpathagar.org

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন অংশ ইংরেজি। অংশগ্রহণকারীদের ৯০ শতাংশ পরীক্ষায় ফেল করেছে। এর মধ্যে শুধু ইংরেজিতে ফেল করেছে ২২ হাজার। তাদের মধ্যে উল্লেখিত নামি-দামি কলেজের শিক্ষার্থীরাও আছে।

আবদুর রহমান ইংরেজিতে ভালো করেছে। ৩০-এ পেয়েছে ২৮.৫০। সম্ভবত ইংরেজিতে প্রাপ্ত এটাই ছিল সর্বোচ্চ নম্বর।

এরপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে পড়তে পারবে না আবদুর রহমান। পড়তে পারবে না বাংলা, সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয়সমূহে। তার দোষ হলো, সে মাদরাসার ছাত্র।

যেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি নিয়ে এমন বৈষম্যনীতি অবলম্বন করতে পারে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তো শিক্ষাদানেরই অধিকার নেই।

সুতরাং বোঝা গেল, সেক্যুলাররা কেন মাদরাসাফোবিয়ায় ভোগে? মাদরাসার ছাত্রদের তাদের মেধা অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ দিলে ৯০%-এর বেশি সেক্যুলার ভর্তিই হতে পারবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কমিউনিটি অ্যাডুকেশন কেন প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে ভালো মডেল

অমর্ত্য সেন তাঁর নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে ১৯৯৯ সালে প্রতীচী ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য। একই সাথে ভারত প্রতীচী ট্রাস্ট আর বাংলাদেশ প্রতীচী ট্রাস্ট—এই দুটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। ভারত ট্রাস্টে আছেন অমর্ত্য সেন ও দিপঙ্কর ঘোষ। সভাপতি হিসেবে আছেন অমর্ত্য সেনের মেয়ে অন্তরা দেব সেন। বাংলাদেশ অংশে আছেন সভাপতি হিসেবে রেহমান সোবাহান, কামাল হোসেন, ফজলে হাসান আবেদ, সুলতানা কামাল ও মেঘনা গুহ ঠাকুরতা।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচয় দেওয়া দরকার ছিল। কারণ, তারা সকলেই বাংলাদেশের সো-কল্ড প্রগতিশীল ও সেক্যুলারদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য। তারা পশ্চিমবঙ্গে খুব ভালো কিছু কাজ করছে; বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যালোচনার কাজটি। শিশুশিক্ষা নিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে

https://nagorikpathagar.org

একটা গবেষণা করেন। তার ফলাফলটা খুব মজার। ফলাফলটা জানার আগে পশ্চিমবঙ্গে 'শিশুশিক্ষা কেন্দ্র' বলে একটা জিনিস আছে সেটা জেনে নেওয়া উচিত। কোনো লোকালয়ের এক কিলোমিটারের মধ্যে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকে, তাহলে সেখানে একটা 'শিশুশিক্ষা কেন্দ্র' খোলা হয়। এটা আমাদের দেশের মক্তব বা পাঠশালার মতো কমিউনিটি অ্যাডুকেশন সেন্টার। শিক্ষকদের বেতন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দশভাগের একভাগ। তার মানে অতি অল্প বা নামমাত্র খরচে এই কেন্দ্রগুলো চলে। এর শিক্ষকরা সেই স্বল্প বেতনে কাজ করেন। স্বল্প মানে এক হাজার রুপি, তাও সেটা তারা নিয়মিত পান না। এই কেন্দ্রগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো রুম নেই। শিক্ষা উপকরণেরও ঘাটতি আছে। শিক্ষকের বাড়ি, কোনো এলাকার মানুষের ব্যবহার করতে দেওয়া স্থান বা সামাজিক সমাবেশ যেখানে হয়, সেখানেই এই কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে—শিক্ষার মান, ছাত্রদের উপস্থিতি, শিক্ষকদের উপস্থিতি, অভিভাবকদের সন্তুষ্টি প্রাইমারি স্কুল থেকে এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অনেক বেশি। অবাক বিষয় বটে! দশগুণের বেশি খরচ করে, শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পেয়ে, স্কুল ভবন এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব না থাকার পরও কেন প্রাইমারি স্কুলগুলোর শিক্ষা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মতো মানসম্মত করতে পারছে না? কেন পারছে না?

এর কারণ হিসেবে গবেষকরা যেসব বিষয় শনাক্ত করেছেন সেটা হচ্ছে—যারা পাঠ নিতে আসছে, তাদের সাথে এবং তাদের দরিদ্র অভিভাবকদের সাথে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের একটা শ্রেণিগত ব্যবধান থাকে। শিক্ষকরা নিজেদের উঁচু শ্রেণির বলে বিবেচনা করেন। ফলে ছাত্র ও অভিভাবকরা শিক্ষকের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা ওই কমিউনিটির সদস্য হওয়ায় কোনো শ্রেণিগত তফাত থাকে না। আর তাদের শিক্ষা বিষয়ে একটা সামাজিক দায় থাকে কমিউনিটির কাছে। শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা ছাত্র এবং তার পরিবারের সাথে একাত্ম হতে পারেন। এই একাত্ম হওয়াটা গবেষকদের কাছে শিক্ষার মান উত্তম হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আর এই একাত্ম হওয়াটা মূলত শিক্ষক সমাজের প্রতি নৈতিক ও রাজনৈতিক দায় হিসেবেই তারা চিহ্নিত করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

সত্যজিত রায়ের পথের পাঁচালী-তে অপুর পাঠশালায় আমরা দেখি, শিক্ষক মুদিখানায় দোকানদারি করেন; আর খালি গায়ে, পিঠ চুলকাতে চুলকাতে আর লবণ মাপতে মাপতে ছাত্রদের বলেন—'এই সেই জলস্থান মধ্যবর্তী।' তারপর আবার এক পয়সার মুড়ি বেচেন, আড্ডা দেন, তামাক খান, ছাত্র পিটান; সবই চলে সেখানে। এই চিত্রকে আমরা যতই অনাধুনিক মনে করি না কেন, আজকের গবেষণায় বলছে, এর কাছাকাছি স্ট্রাকচারে শিক্ষার মান আধুনিক স্কুলের চেয়ে অনেক ভালো।

কমিউনিটি এডুকেশনের ধারণা কি বাংলাদেশের সেক্যুলাররা মানবেন? কওমি মাদরাসাও কিন্তু কমিউনিটি এডুকেশন!

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তান কি ৭১-এর কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল

অনেকে দাবি করেন, পাকিস্তান ৭১-এর কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়নি। তাদের ক্ষমা চাইতে হবে—এ নিয়ে তারা নানা মন্তব্য করেন। আমাদেরও মনে হয়, এই গণহত্যা করে পাকিস্তান ক্ষমা না চেয়ে থাকবে, সেটা হতে দেওয়া যায় না।

আমরা ইতিহাসে কী দেখি? পাকিস্তান কি আসলেই ক্ষমা চেয়েছিল? আমরা কি সেই ক্ষমা গ্রহণ করেছিলাম?

১৯৭৪-এর ৫ থেকে ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। এর অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার। এই সভায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন—

> '(My) Government condemned and deeply regretted any crimes that may have been committed.'
>
> '(আমার) সরকার কোনো অপরাধ সংগঠিত করে থাকলে তার নিন্দা জানায় এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।'

https://nagorikpathagar.org

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও বলেন–

> 'To forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation.'
> 'মিটমাট ত্বরান্বিত করার জন্য অতীতের সমস্ত ভুল ক্ষমা করে দিন এবং ভুলে যান।'

এই দুই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয়—

> 'Not to proceed with trials as an act of clemency.'
> 'ক্ষমাশীলতার নিদর্শনস্বরূপ এই বিচার প্রক্রিয়ায় (বাংলাদেশ) আর অগ্রসর হবে না।'

দেশে ফিরে ১১ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে ড. কামাল হোসেন বলেন—

> 'বাংলাদেশে পাকিস্তান যে অপরাধ করেছে তা প্রতিষ্ঠা করা, পাকিস্তান কর্তৃক তার সব অপরাধকে স্বীকার করানো এবং বাংলাদেশের বিচার অনুষ্ঠানের সামর্থ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রস্তাবিত যুদ্ধাপরাধী বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান ক্ষেত্রেও পাকিস্তান তার অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় এই লক্ষ্য অর্জন করা গেছে।'

ড. কামাল হোসেনের এই বক্তব্য পরদিন *দৈনিক বাংলা*'য় প্রকাশিত হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছে 'পাকিস্তান অপরাধ স্বীকার করেছে ও ক্ষমা চেয়েছে।'

তাহলে মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি সেদিন দেশের জনগণকে মিথ্যা কথা বলেছিল? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৩-এর নির্বাচনে 'যুদ্ধাপরাধীর বিচার' আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল।

এটা কি তথাকথিত চেতনার সোল এজেন্টরা জানেন না? ভালোই জানেন। তবুও তারা এটা নিয়ে কথা বলেন কেন? কথা বলেন কারণ, তারা বাংলাদেশের জনগণকে বোকা ভাবেন।

রাষ্ট্রের নানান অসংগতি, জুলুম ও অন্যায় আড়াল করার জন্য তারা এমন সব বির্তক হাজির করেন—যাতে রাষ্ট্রের জুলুম চাপা পড়ে যায়, আড়ালে চলে যায়।

পাকিস্তানকে আমরা গণহত্যার দায়মুক্তি দিতে চাই না। কিন্তু চেতনাজীবীদের জবাব দিতে হবে, কেন তারা এবং তাদেরই সরকার ১৯৭৪-এ পাকিস্তানের বক্তব্যকে 'অপরাধ স্বীকার আর ক্ষমা প্রার্থনা' বলে গ্রহণ করেছিল?[৫]

---

৫. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; ড. মোহাম্মাদ সেলিম, বাংলা একাডেমি ২০০৯, পৃষ্ঠা : ১০৪-৫

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত কী খায়েশে সাহায্য করেছিল

আমরা বুঝতেই পারি, ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারা তাদের বয়ানে সেইসব আলাপ কীভাবে করেছিল তার কিছু হদিস নেওয়া যাক।

প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সমর গুহ বলেছিলেন–

> 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের বাংলা ভাগের বেদনা উপশমের একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'[৬]

কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তো বাংলা ভাগ চায়নি। বাংলা ভাগ তো চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নেতারা। তাদের গোয়ার্তুমিতেই বাংলা ভাগ হয়েছিল। তাহলে বাংলা ভাগ সমর গুহদের জন্য বেদনার বিষয় কেন হবে? সেটার কারণ হচ্ছে, বাংলা ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথেই পূর্ববঙ্গের জমিদারিও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। জমিদারি লুণ্ঠনের টাকা পশ্চিমবঙ্গে আসা বন্ধ হয়ে যায়। এর সাথে শুরু হয় পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া উদ্বাস্তুদের স্রোত। কলকাতার সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে। এটাই তাদের কাছে বাংলা ভাগের বেদনা। যেই ভুল তারা করে ফেলেছিল, সেটা শোধরানোর সুযোগ এসেছে বলে তারা মনে করেছিল। তারা আর কী কী ভেবেছিল, এই বিকল্প পথে জমিদারি ফিরে পাওয়ার তরিকা হিসেবে?

মুক্তিযুদ্ধ চলাকলে ইন্ডিয়ান জার্নাল লিখেছিল–

> 'স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হলে বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক উপকারী বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। ভৌগোলিকভাবেই উপমহাদেশে যে পরিবহণ ও বাণিজ্য লেনদেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, তার পুনঃস্থাপন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে উৎপাদন খরচ কমাবে। এই একীভূত বিশাল বাজার বিপুল বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে। মৃতপ্রায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পুনর্জীবিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে তার রাজনীতিও পরিবর্তিত হবে।'[৭]

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুর্গতির সাথে সাথেই সেখানে বাম ও চরমপন্থার উত্থান ঘটছিল। রাজনীতির পরিবর্তন হবে–

---

৬. The Hindu, 28 March 1971, Page: 9

৭. Ashok Sanjay Guha, 'Bangla Desh and Indian Self- Interest' Economic and Political Weekly (Bombay), vol. vi , 15 May 1971, Page: 9 & 3

https://nagorikpathagar.org

অশোক সঞ্জয় গুহ তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর ব্রিটিশ আমলের যোগাযোগব্যবস্থার পুনঃস্থাপন বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে—আজকের কানেক্টিভিটির নামে ট্রানজিট আর ট্র্যানশিপমেন্ট।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসেই তারা লিখছেন—

> 'একটি বন্ধুসুলভ বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের একটি অবাধ বাজার উন্মুক্ত করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তা একটি পরিপূরক অর্থনীতি হয়ে দাঁড়াবে। ধুঁকতে থাকা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির জন্য তা যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করবে।'[৮]

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই *দ্যা হিন্দু*'তে একটা নিবন্ধ ছাপা হয়, সেখানে লেখা হয়–

> '(বাংলাদেশের জন্মের ফলে) ভারতের কৌশলগত প্রকল্প ত্রিপুরায় তেলের অনুসন্ধানের কাজটি সম্পন্ন হবে। অপরিশোধিত তেল পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে আসাম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বাংলাদেশের বন্দর চট্টগ্রামে নিয়ে এসে সেখান থেকে জাহাজে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এলে পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম হবে।'[৯]

এমনকী তারা এটাও ঠিক করে রেখেছিল যে—

> 'বাংলাদেশের মুদ্রামান বেশ কিছু সময় ধরে ভারতের সমান করে রাখতে হবে। কারণ, ভারতই হবে বাংলাদেশের প্রধান ও প্রভাবশালী বাণিজ্য সহযোগী। এ ছাড়াও বাংলাদেশ তো ম্যানুফ্যাকচার্ড পণ্য বেশির ভাগ ভারত থেকেই পাবে।'[১০]

ভারতীয় পুঁজি এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ বাংলাদেশের সহজাত স্বার্থের সাথে একাকার। এর কারণ এই নয় যে, বাংলাদেশে শ্রম সস্তা; বরং যৌথ বিনিয়োগ বাংলাদেশ আর পূর্ব ভারতের অর্থনীতির প্রকৃত একীকরণ ঘটাবে, যেই এলাকা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই অর্থনীতির অধীনে ছিল।[১১]

---

৮. J. Bhattacharjee, 'Case for Indian Military Intervention' Economic and Political Weekly, vol. vi, no. 27, 3 July 1971, Page: 1323

৯. The Hindu , 11 January 1972, Page: 8

১০. Boudhayan Chattopadhyay, 'Impact of Bangladesh: Economic Dimensions', Seminar # 150, February 1972, Page: 22-28

১১. Rajan, 'Bangladesh and After' Pacific Affairs » vol. 45, no. 2, (Summer 1972), Page: 201

https://nagorikpathagar.org

ভারত নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিল তার নিজস্ব লাভ-ক্ষতির হিসাব করেই। তার হিসাব-নিকাশে লাভের পাল্লা ভারী ছিল বলেই তারা আমাদের সাহায্য করেছিল। এই সাহায্য নিছক কোনো সদিচ্ছাজাত ছিল না, যা ভারতের তরফে বলার চেষ্টা করা হয়।

যে সমস্ত ভারতীয় ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, ভারত তার নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থ ও কৌশলগত লাভের কথা চিন্তা করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এই হিসেবে ক্ষতির পাল্লা বেশি হলে ভারত কোনো অবস্থাতেই সাহায্যে এগিয়ে আসত না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কি শুধু ভারতই শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল

আমরা শুধু শুনে এসেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের শুধু ভারতই আশ্রয় দিয়েছিল। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিয়ানমারেও (বার্মা) বাংলাদেশের শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল, আর তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত রাখাইন প্রদেশেই।

১৯৭১ সালের ১৮ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মিয়ানমারের জনগণ আর সরকারকে ধন্যবাদ জানান।[১২]

অবশ্য মিয়ানমারের মুসলিম জনগণের বদান্যতার এই ইতিহাসকে মুছে দেওয়া হয়েছে এবং ভারতকে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার পূর্ণ কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে দেওয়ায় আমাদের চেতনা শিবিরে কোনো গ্লানি হয়নি। নিশ্চয় রোহিঙ্গাদের মধ্যে বয়স্করা এই ঘটনা জানে। তারা আমাদের কী বলেছে? আমাদের নিয়ে কী ভেবেছে—ভাবুন একবার। একবারও কি কেউ বলেনি 'অকৃতজ্ঞ!'

---

১২. মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র; ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৩

https://nagorikpathagar.org

ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণা

'শত্রু সম্পত্তি' আইনের মতো আইন ভারতে হয়েছে অনেক আগে

ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি 'শত্রু সম্পত্তি' (বাংলাদেশ আমলে 'অর্পিত সম্পত্তি') আইনের কথা। সেই সময় থেকেই ভাবছি পাকিস্তান একটা বর্ণবাদী রাষ্ট্র, এ রকম একটা আইন কীভাবে করল? এই শত্রু সম্পত্তি আইন হয় ১৯৬৫ সালে।

ভারতে 'The Evacuee Property Ordinances' নামে একটা কালো অধ্যাদেশ হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। সেক্যুলার আইকন নেহেরু এই অধ্যাদেশটা করেছিল। সেখানে সকল মুসলমানকে 'Potential Evacuee to Pakistan (সম্ভাব্য পাকিস্তানি উদ্বাস্তু)' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এর ফলে পাকিস্তানে চলে যাওয়া যেকোনো এক পরিবারের সদস্যের জন্য সম্পত্তি বিক্রি করা বা দখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি ভারতে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য উদ্ধার হওয়া বা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানিদের সাঁকো নাড়ানোর কথা কে মনে করিয়ে দিয়েছিল? এই প্যান্ডোরার বাক্স খুলেছিল সেক্যুলার নেহেরু। বাংলাদেশ ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হয়। বাস্তবায়ন যাই হোক, আইন তো হয়েছে। কিন্তু The Evacuee Property Ordinances-এর খবর কী? বাংলাদেশে যারা শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবিতে এত দিন আন্দোলন করেছিলেন, তারা কি দুই দেশের দুই আইন The Evacuee Property Ordinances এবং শত্রু সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে একসাথেই দুই দেশে আন্দোলন করতে পারতেন কি না? তা করতে পারলে এটা একটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইস্যু হয়ে যেত। সমাধানও সহজ হতো।

https://nagorikpathagar.org

এটা করেননি কেন? নেহেরুকে বাঁচানোর জন্য, নাকি জানতেন না এই ইন্ডিয়ান আইনের কথা? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও কি জানতেন না ভারতীয় এই অধ্যাদেশের কথা?[১৩]

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতের সংবিধানে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিপরেক্ষতা যুক্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বলতে রাষ্ট্র আর ধর্মকে আলাদা করার যে তরিকা আমরা পাশ্চাত্যে দেখি, তা এই ধর্মনিরপেক্ষতাতে নেই। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীন বা ধর্মে উদাসীন নয়; বরং সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী ধর্মের কারণে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা অবশ্যই যেকোনো সভ্য রাষ্ট্রের নীতি। ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের ধর্ম ঘোষণা, আচরণ এবং প্রচার করার সমান অধিকার আছে। ২৬ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি নামধারী ধর্মগোষ্ঠীরই অধিকার আছে, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করার, নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার এবং এ উদ্দেশ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, অধিগ্রহণ এবং পরিচালনা করার। এই ধারায় মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণকেই মূলত উৎসাহিত করা হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, সংবিধানের ১৪ ধারায় আইনের চোখে সব নাগরিকের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর ১৫ ধারায় ধর্মের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ আরও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ১৪ এবং ১৫ ধারায় ঘোষিত নীতি ভারতের একই সংবিধানে ও রাষ্ট্রীয় প্র্যাকটিসে নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন : আইনব্যবস্থা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংবিধানের ১৫(৪) এবং ১৬(৪) ধারায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে যে সংরক্ষণের অধিকার আছে, সরকারি নীতিতে এবং আইনে তা শুধু হিন্দু হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্যই প্রয়োগ করা হয়, পিছিয়ে পড়া মুসলিম বা খ্রিষ্টানদের জন্য তা প্রয়োগ করা হয় না।

---

১৩. Muslim Belonging in Secular India; By Taylor C. Sherman, Cambridge University Press, Page: 176

https://nagorikpathagar.org

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সে রকম অনুদানের কোনো বিধি নেই। আবার অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য আয়কর আইনে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা অন্য ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে নেই।

আমাদের সেক্যুলারপন্থিদের কাছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলই আদর্শ। ভারতের মডেলের ধর্মচারণকে মূলত উৎসাহিত করা এবং ভেতরে ভেতরে হিন্দুত্বের প্রতি পক্ষপাতের বিষয়ে তারা কী বলেন, জানতে ইচ্ছা করে।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের একটা পোস্টারে নেহেরুর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সেক্যুলার ভারত গড়ার। কিন্তু নেহেরু তার জীবদ্দশায় ভারতের সংবিধানে সেক্যুলারিজম শব্দটা যোগ করেননি। ভারতের সংবিধানে সেক্যুলারিজম যুক্ত হয়েছে ১৯৭৬-এ। অবাক বিষয় নয় কি? ভারতের সংবিধানে সেক্যুলারিজম যেই ফর্মে ঢুকেছে সেটার পর্যালোচনা করলে এটাই বেরিয়ে আসে যে, বাংলাদেশের জন্ম ভারতীয় মানসে কিছু পরিবর্তন করেছিল। আজন্মশত্রু পাকিস্তানের বুক চিরে যে নতুন রক্তাক্ত বাংলাদেশের জন্ম হলো,

https://nagorikpathagar.org

সেই বাংলাদেশের মুসলমানরাই তো পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রণী ছিল। এই পরিবর্তিত শত্রু (!)-কে কী নামে ডাকলে স্বস্তিকর হয় ভারতের জন্য? আমার ধারণা, বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সেক্যুলারিজম সেই স্বস্তিকর ডাকনাম—যা বাংলাদেশের মুসলমান পরিচয়কে তাদের কাছে মৃদু করে। নেহেরু নিজেকে প্রকাশ্যে ধর্মে অবিশ্বাসী বলতেন। কিন্তু আশীষ নন্দী The Romance of the State. And the Fate of Dissent in the Tropics-এ জানাচ্ছেন—নেহেরু ছিলেন জ্যোতিষে বিশ্বাসী এবং ব্যক্তিগত জীবনে গোপনাচারী হিন্দু। বামপন্থি নেতাজি সুভাষ বসু ছিলেন এক গীতাপ্রাণ গুপ্ত সন্ন্যাসী এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় নেশন স্টেটের প্রকাশ্য পূজারিণী এবং প্রকাশ্যে ধর্মে অবিশ্বাসী ইন্দিরা গান্ধি, যার হাত ধরেই ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ভারতের সংবিধানে ঢুকেছে; তিনি হোমযজ্ঞ বা তীর্থ যাত্রায় অংশ না নিয়ে থাকতে পারতেন না। তাই ভারতের সেক্যুলারিজমের ধারণা মুসলমান পরিচয়ের বিপরীতে দাঁড়ানো একটা রাজনৈতিক প্রপঞ্চ, যার সাথে ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টের কোনো যোগ নেই।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভে কী লেখা আছে

সত্যমেব জয়তে

https://nagorikpathagar.org

অশোক স্তম্ভ হলো ভারত রাষ্ট্রের এনব্লেম বা রাষ্ট্রীয় প্রতীক। এটার নিচে সংস্কৃতে লেখা আছে—ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিবাক্য 'সত্যমেব জয়তে'।

এর অর্থ 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী'। অর্থ যতই মধুর হোক না কেন, এটা ধর্মীয় মন্ত্র। 'সত্যমেব জয়তে' মার্কণ্ড উপনিষদের একটি মন্ত্র।

সেক্যুলার ভারতে রাষ্ট্রীয় নীতিবাক্য উপনিষদ থেকে নেওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নীতিবাক্য যদি কুরআন থেকে নেওয়া হয়, সেটা যতই মধুর হোক না কেন, তাহলে সব সেক্যুলার হই হই করে উঠবেন, 'গেল গেল' বলে রব তুলবেন।

যখন ভারতের এই এনব্লেমটা প্রস্তাবিত হয়েছিল, তখন সেখানে উপনিষদের মন্ত্র দেওয়ার কোনো প্রতিবাদ হয়েছিল? কেউ কি জানেন? তখন সেক্যুলাররা কি হইচই করেছিল?

https://nagorikpathagar.org

'সাম্প্রদায়িক' শব্দটা কেন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়

এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। কোনো সম্প্রদায়ের সাথে বাস করা ও মিশে থাকার ফলে তাদের জন্য তৈরি হওয়া আলাদা অনুভূতি সৃষ্টি নেতিবাচক কিছু না। নিজ সম্প্রদায়ের সাথে থাকা বোঝাতে 'সাম্প্রদায়িক' একটা ইতিবাচক শব্দ। ঠিক যেমন ইংরাজিতে কমিউন বা কমিউনিটি শব্দটা খুবই ইতিবাচক শব্দ। কোনো ডেরোগেশন বা ডেরোগেটরি শব্দের অর্থ নয় এটা।

বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটাকে গালি হিসেবে চালু করে তোলার কৃতিত্ব হিন্দুদের। এটা মুসলমানদের গালি দেওয়ার জন্য হিন্দুদের একটা আবিষ্কৃত শব্দ। এমনভাবে শব্দটা ব্যবহার করা হয়, যেন এটা শুনতে শোনায় এমন– 'তুই ব্যাটা মুসলমান।'

তবে হিন্দুরাও এককালে এই শব্দটা কিন্তু পজিটিভ অর্থেই ব্যবহার করত। ১৮২৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দর্পন* পত্রিকায় একজন সম্পর্কে ভালো কথা বলার জন্য লেখা হচ্ছে—

'সাম্প্রদায়িক মর্য্যদক পরোপকারক সহনশীল মনুষ্য ছিলেন।'

এখানে সাম্প্রদায়িক শব্দটির অর্থ 'আপন সম্প্রদায়ের'। সম্প্রদায়ের মানুষ বোঝাতে রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন এই শব্দটা। তিনি লিখেছেন—

'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধোঁয়া আছে।'

https://nagorikpathagar.org

এটা তিনি লিখছেন ১৯০৭ সালে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ অর্থে বিদ্বিষ্ট হিসেবে এই শব্দটির রবীন্দ্রনাথ আবার ব্যবহার করেছেন আরও পরে ১৯৩১ সালে। যেমন তিনি লিখেন–

> 'পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবুজ রঙের বিদেশি পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাইনে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায়নি কিংবা এখানকার অন্য আশ্রিত পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।'

সেই কারণেই প্রায় ১০০ বছর আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানে 'সাম্প্রদায়িক' বলে কোনো শব্দ নেই। ১৯৩৪ সালে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বলা হয়েছে—

১. সম্প্রদায় হইতে আগত।

২. সম্প্রদায় বিশেষের মতাবলম্বী।

কিন্তু অধুনা সংসদ বাংলা অভিধানে এই সাম্প্রদায়িকতা শব্দের এই বার একটা তিন নম্বর অর্থ যুক্ত হতে দেখি, তা হচ্ছে—'সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন'।

তাহলে আমরা খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এই শব্দটিকে একটা গালি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এখানে খুব কৌশলে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু গালিটা কাকে?

এবার দেখুন এটার প্রথম দিককার পলিটিক্যাল ব্যবহার।

১৯৩৭ সালে শেরেবাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইনের একটা সংশোধনী বিল আনেন। সেই বিলে ছিল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের তিনটা সংশোধনী। বলে রাখা ভালো, এই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দিয়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারি প্রথার আইনি ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়।

শেরে বাংলার সংশোধনীগুলো ছিল :

১. রায়ত যদি জমি হস্তান্তর করতে চায়, জমিদারের বাগড়া দেওয়া ছাড়াই জমি স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ও ভাগ করতে পারবে।

২. জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার রদ করা হয়।

৩. সেলামি ও নজরানা ফি নামের জমিদারকে দেওয়া জমি হস্তান্তর ফি বাতিল করা হয়।

https://nagorikpathagar.org

খেয়াল করলে দেখবেন, জমিদারের কর্তৃত্বকে ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছিল এই বিলে। হিন্দু জমিদাররা এই প্রথম এই বিলকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে প্রত্যাখ্যান করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কী আছে? এটা তো একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। জমিদারের পেটে লাথি মেরেছে ঠিকই, কিন্তু এটা 'সাম্প্রদায়িক' হয় কীভাবে?[১৪]

এরপরে ১৯৪৮-এর ৭ এপ্রিল পূর্ববাংলা বিধান পরিষদে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের জন্য 'পূর্ববাংলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল' উত্থাপন করা হয়। বিধানসভার নেহেরু কংগ্রেসের সদস্যরা বিলটির বিরোধিতা করেন। একজন বিধায়ক বলেন—

> 'স্যার, আমি এ ব্যাপারে আরও বলতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ বড়ো জমিদাররা হিন্দু হওয়ার ফলে তা প্রস্তাবিত বিলটিকে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে।'[১৫]

এই কংগ্রেসি আলোকে এইবার সাম্প্রদায়িকতা আর অসাম্প্রদায়িকতা শব্দ দুটোর মর্মার্থ খুঁজুন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আমার সেই জমিদারির রুস্তমি ফিরিয়ে দাও।

তাই সেক্যুলার বয়ানে সাম্প্রদায়িকতা মানে জমিদারি কেড়ে নেওয়া; আর অসাম্প্রদায়িকতা অর্থ হচ্ছে জমিদারি ফেরত দেওয়া। অবশ্য তারা জমিদারি মানে ম্যাটারিয়াল ফর্মে জমিদারি বোঝায় না। যা বোঝায় তা হচ্ছে– সেই জমিদারি শান-শওকত, সামাজিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক প্রভাব, কালচারাল রুস্তমি এগুলো সবই।

অর্থাৎ হিন্দুদের তৈরি বয়ানে, চিন্তার কাঠামো এবং কন্সট্রাকশনের যেই বিরোধিতা করবে, হিন্দুদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অথরিটি করে সাজানো বাগানের অর্ডার বা শৃঙ্খলায় যে আঘাত করবে, ভিন্নভাবে সাজাতে চাইবে, নিজের ভাগ, অধিকার চাইবে—সেক্যুলার এবং হিন্দুকুল তাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেবে।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে কেন

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতে একটা প্রচারণা আছে যে, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে। কারণ, তারা বাংলাদেশে মুসলমানের নির্যাতনের কারণে

---

১৪. বাঙলা ভাগ হল; জয়া চ্যাটার্জি, ইউপিএল, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ১২৫

১৫. পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি; বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা : ১৩১-১৩২

https://nagorikpathagar.org

থাকতে পারে না, তাই তারা দেশত্যাগ করে। এই বয়ানের পক্ষে তারা সব সময় সোচ্চার থাকে। অস্বীকার করছি না যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হয় না। কিন্তু নির্যাতনের কারণে দেশত্যাগ করায় হিন্দুদের সংখ্যা কমছে—এটা কোনোভাবেই তথ্য সমর্থন করে না।

Numerical Distribution and Percentage Variation by Major Religious Communities, 1901-2001

Census Year	Population (000)	Muslim		Hindu		Buddhist		Christian		Others	
		Number (000)	Percent Variation	Number (000)	Percent Variation	Number (000)	Percent Variation	Number (000)	Percent Variation	Number (000)	Percent Variation
1901	28927	19113	NA	9545		......	NA	......	NA	269	NA
1911	3155	21202	10.9	9952	4.3	......	NA	......	NA	401	49.1
1921	33254	22646	6.8	10166	2.2	......	NA	......	NA	442	10.2
1931	35604	24731	9.2	10453	2.8	......	NA	61	NA	359	(-)18.8
1941	41999	29509	19.3	11747	12.4	......	NA	53	(-)13.1	690	92.2
1951	41933	32227	9.2	9239	(-)21.3	319	NA	107	101.9	41	(-)94.1
1961	50840	40890	26.9	9380	1.5	374	17.2	149	39.3	47	14.6
1974	71478	61039	46.3	9673	3.1	439	17.4	216	45.0	111	136.2
1981	87120	74587	23.7	10570	9.3	538	22.6	275	27.3	250	125.2
1991	106315	93881	24.4	11179	5.8	623	15.8	346	25.8	286	14.4
2001	123851	111079	18.3	11379	1.79	840	34.8	357	3.3	198	(-)30.8

Source : National report (Provisional), Bangladesh Population Census 2001, page 05

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমার দুটো প্রধান কারণ—

১. ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। তাই এই রাষ্ট্র অভারতীয় রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের সম্ভাবনা জাগরূক রাখে। তারা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতন মনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারতরাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে। একইভাবে শ্রীলংকান তামিলদের ভারতে মাইগ্রেশনের একটা ট্রেন্ড আছে। নেপাল থেকে হিন্দুদের তো ভারতে মাইগ্রেশন হয় না; কারণ, তারাই তাদের রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দু তাদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ভারত রাষ্ট্রে নিজেদের মাইগ্রেট করতে পছন্দ করে; যার ফলে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে।

২. হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার কম। ১৯০১ সাল থেকে হিন্দুদের প্রজনন হার মূলত ২-৫ শতাংশ। ১৯৪১ সালেই তা একবার ১০%-এর ওপরে উঠেছিল। মুসলমানদের প্রজনন হার ১৯৪৭-এর পর থেকেই ২০%-এর ওপরে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না।

তাহলে বাংলাদেশে ধর্মীয় নির্যাতন নিয়ে কি আমাদের কিছুই বলার নেই? নিশ্চয় আছে।

এই সমস্যা আসলে কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়; এই সমস্যা মূলত রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা। একটা সফল রাষ্ট্র বানাতে পারলে এই সমস্যা থাকত না। এপার ও ওপারের সেক্যুলাররা মনে করে, বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে না পারলে বুঝি নাগরিক হিসেবে হিন্দু বা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা যেন করতেই হবে। হিন্দু নির্যাতন মাত্রই

https://nagorikpathagar.org

সাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করার অভ্যাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটাই 'ওয়ার অন টেরর' প্রোজেক্টের বয়ান। যার লক্ষ্য হচ্ছে—মুসলমানদের বর্বর, পরধর্মে অসহিষ্ণু, ভিন্নচিন্তার প্রতি খড়্গহস্ত হিসেবে দেখানো।

এ দেশের হিন্দুদের নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে হিস্সা দাবি করতে হবে। অথচ অবাক বিষয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা নাগরিক হিসেবে নয়; বরং হিন্দু হয়ে আলাদা সুরক্ষার দাবি তুলছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য আলাদা আসন দাবি করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট আরও স্পষ্টভাবে পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা, পৃথক মন্ত্রণালয় ও সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসনের দাবি জানিয়েছে।

এটা ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের শাসন চলছে, সেই শাসকদের অংশ হিসেবে হিন্দুরাও জাতীয় সংখ্যাগুরু। বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে তার সম্প্রদায়গত অবস্থান নির্যাতিতের নয়।

বাংলাদেশে যে ফ্যাসিস্ট শাসন জনগণের ওপরে চেপে বসেছে, তার ভিত্তিকে প্রশ্ন করতে না শিখলে আমরা কখনোই বাংলাদেশকে একটা অগ্রসর রিপাবলিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না; হিন্দু নির্যাতনের ফয়সালা তো দূরের কথা।

হিন্দুরা কি বাংলাদেশে নিপীড়িত

'হিন্দুরা বাংলাদেশে নিপীড়িত'—এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বয়ান। বাংলাদেশের বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা এই ইন্ডিয়ান পজিশনকে ইন্টেলেকচুয়ালি সাপোর্ট করে। ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে একটা আধুনিক রিপাবলিক হিসেবে না দেখিয়ে নানা ধর্মে বিভক্ত রাষ্ট্র হিসেবে চিন্তা করে। সেই রাষ্ট্রে নাগরিকের বদলে হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় বাস করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা হিন্দুদের কুপিয়ে দেশছাড়া করছে—এই বয়ান হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চরিত্রের কারণে এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমানভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত—এই সত্যটাকেও আড়াল করা যায়। সরকারের চিন্তার বাইরের রাজনৈতিক চিন্তার লোকেরা যে নিজের ভিটায় যেতে পারে না, মাঝেমধ্যে সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়। গুম, অপহরণ, ক্রসফায়ার,

https://nagorikpathagar.org

জেল-জুলুম আর গুলিতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় অনেক বেশি নির্যাতিত হয়েছে, তার যে অনেক বেশি রক্ত ঝরছে, জীবন গেছে, সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়।

ইন্ডিয়ান এই যুক্তির পক্ষে তারা যে তথ্য হাজির করে তা হচ্ছে—বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে, তারা দেশত্যাগ করছে। অথচ বাংলাদেশে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না। এর কারণ অন্য কোথাও।

কলকাতার বর্ণ-হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে থাকতে চায়নি ১৯৪৭-এ। তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চায়নি। তাই মুসলমানরা না চাইলেও হিন্দুদের জেদের কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানের সাথে এক দেশের নাগরিক হয়ে থাকবে না, তাই তারা সেই সময় থেকে দেশত্যাগ করছে। এটা সম্প্রদায়গত সচেতন সিদ্ধান্ত। কিন্তু তারা এর দায় বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর চাপাতে চায়। এখানে বাঙালি মুসলমানের কোনো দায় নেই। আমি আগেই বলেছি, ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। ভারত রাষ্ট্র অভারতীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের লোভ জাগিয়ে তোলে। অভারতীয়রা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতন মনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারত রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে।

'আমরা বাংলাদেশে মুসলমানের লগে মিলামিশা থাকুম'—এই চিন্তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেদিন থেকে শুরু হবে, সেদিন বাংলাদেশে নতুন জামানার শুরু হবে। হিন্দু নির্যাতনের ইন্ডিয়ান রেকর্ড বাজিয়ে বাংলাদেশে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। এটা যত তাড়াতাড়ি বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা বুঝবে, ততই হিন্দুদের মঙ্গল।

এই সত্য কথাটার জন্যই আমি বাম, সেক্যুলার, চেতনাবাজ আর শিবসেনাদের কাছে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে যাই। আশ্চর্যের বিষয়!

https://nagorikpathagar.org

এই ভূখণ্ডে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোথায় হয়

আমাকে অনেক আগে এক রাজনৈতিক নেতা গলা কাঁপিয়ে বলেছিল—'জানেন, আমাদের ময়মনসিংহ এমন প্রগতিশীল এলাকা যে, এখানে জীবনেও কখনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি?' আমি বলছিলাম—'না, জানতাম না, এইমাত্র জানলাম।'

এরপর পড়তে পড়তে জানলাম, এ ভূখণ্ডের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ১৯০৭ সালে কুমিল্লা আর জামালপুরে। এই দাঙ্গা এত ভয়াবহ ছিল যে, ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে এ দাঙ্গা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

কারণ কি ছিল জানেন? খুবই অদ্ভুত! কংগ্রেস কর্মীরা দরিদ্র মুসলমানদের স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে বাধ্য করছিল আর বিদেশি পণ্য মুসলমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিত।

সারা দেশেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের নথি থেকে জানা যায়, ১৯০৫ সালে শুধু নভেম্বর মাসেই বরিশালে বিদেশি পণ্য কেনার অপরাধে স্বদেশি কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় মুসলমানদের ওপর হামলা করে ষাট বার। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে।

এ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য হিন্দু ইতিহাসবিদের তরফ থেকে একতরফা মুসলমানদের দায়ী করা হয়। তাদের ভাবখানা এমন যে, 'আমরা তোমাদের পিটাইব, তোমরা ব্যথা পাইবা কেন?'

আওয়ামী লীগের সেই নেতা জীবিত নেই, তাই তাকে এটা জানাতে পারলাম না।

ভারতে মুসলমান নিপীড়ন বনাম বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন

ভারতে মুসলমান নিপীড়ন হলেও ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানে যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন হলে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে যায়। কেন যায়? এই প্রসঙ্গে আমাদের সেক্যুলারদের বয়ান হচ্ছে—ভারতে আধুনিক ও প্রগতিশীল মানুষের শক্তিশালী অবস্থান আছে তাই।

https://nagorikpathagar.org

খুব মজার বিষয়। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। ভারতে এই আধুনিক ও প্রগতিশীল মানুষের অবস্থান এতই শক্তিশালী যে, একেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম কতল হয়ে যায়। শুধু মুসলিম না; কতল হয় শিখ, কতল হয় দলিত। তারপরও 'মেরা ভারত মহান'। বাংলাদেশ কেন ভারতের মতো হচ্ছে না, কেন বাংলাদেশের মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে 'বন্দে মাতরম' বলছে না, এই চিন্তায় তাদের ঘুম আসে না।

এই প্রশ্নের প্রধান উত্তর হচ্ছে—রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতের মুসলমান আর বাংলাদেশের হিন্দুদের বিপরীতমুখী চিন্তা। ভারতের মুসলমানরা ভারত রাষ্ট্রকে তাদের পলিটিক্যাল এজেন্ট বলে গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান তাদের পলিটিক্যাল এজেন্ট নয়। তাই সে তার পলিটিক্যাল এজেন্ট 'ভারত' নামের রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই তার সমস্ত রাজনৈতিক ফয়সালা করে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই রাষ্ট্রকে ছেড়ে দিয়ে তার সমস্যার সমাধান খোঁজে না। এটা ভারতীয় মুসলমানদের শক্তির দিক। এমনকী তাদের রাজনৈতিক ফয়সালার জন্য তার মুসলিম আত্মপরিচয়কে সেক্যুলার জামা পরেও ঢেকে রাখার দরকার হয় না। ভারতের মুসলমানদের সেক্যুলাররা পুতুপুতু করে রক্ষা করে না। ওরা বিপদ এলে নিজেরাই লড়াই করে। কখনো কখনো দলে দলে মরে, আবার ফিনিক্স পাখির মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতের মুসলমানদের মতো বাংলাদেশের হিন্দুরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তার পলিটিক্যাল এজেন্ট ভেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হলেই কেবল তাদের দেশত্যাগ বন্ধ হবে।

মালেয়েশিয়াকে সেকেন্ড হোম বানানো বা দেশে ভবিষ্যৎ নেই বলে যেসব উচ্চবিত্তরা দেশ ছাড়ছেন, একটা বিদেশি পাসপোর্ট হাতে পাওয়াকেই যারা জীবনের মোক্ষম অর্জন ভাবছেন, তারাও এই একই মনোভাবে আক্রান্ত। তারাও বাংলাদেশকে তাদের পলিটিক্যাল এজেন্ট মনে করে না। তারা মনে করে না যে, এই পোড়ার দেশে তার বিকাশের কোনো শর্ত উপস্থিত আছে।

কেন আমি সকাল-বিকাল মুসলমানদের গালিগালাজ করি না

তপন রায় চৌধুরী যখন 'বাঙালনামা' নিয়মিত দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন, তখন প্রতিটি পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর অসংখ্য চিঠি পেতেন। তিনি স্বীকার করেছেন, এর মধ্যে দুই-একজন পত্রলেখক তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

https://nagorikpathagar.org

বাঙালনামা বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি প্রথম সংস্করণের নিবেদনে সেসব পত্রলেখকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তবে এটা উল্লেখ করার পরেই তিনি একটা খুব মজার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন– 'কিছু পত্রলেখকের চিঠিতে এক বিচিত্র বিদ্বেষ-প্রণোদিত মনোভঙ্গির প্রকাশ দেখেছি। অনেকেরই আপত্তি– মুসলমানদের আমি যথোচিত গালিগালাজ করিনি।'

কুমিল্লায় জন্ম নেওয়া এই বিখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ আজ বেঁচে নেই। তাই সেসব পত্রলেখকের দল আমার লেখা দেখে প্রোফাইলে এসে সমালোচনার ঝড় তোলে, কেন আমি নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুসলমানদের যথোচিত গালিগালাজ করি না।

স্বামী বিবেকানন্দের মুসলিম সমাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন

> 'মুসলমানদের ভারত অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারি আর বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র।'

স্বামী বিবেকানন্দ, মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিবেকানন্দের এই কোটেশন দেখে হিন্দু দাদারা যদি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের ছোটো করার জন্য আমি এটা খুঁজে বের করেছি, তাহলে ভুল করবেন। আর মুসলমান ভাইয়েরা যদি মনে করে থাকেন আপনাদের কেবল গুণকীর্তন করা হয়েছে, তাহলে আপনারাও বিরাট ভুল করবেন। হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব থেকে কিছু সময়ের জন্য বের হয়ে ভারত এবং বাংলার ইতিহাসটা বোঝার চেষ্টা করুন, মঙ্গল হবে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের দাবি রাষ্ট্র ধ্বংসের পাঁয়তারা

যুগান্তরে ৮ এপ্রিল, ২০১৭-এ একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসন চায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। এ ছাড়া তাদের সাত দফা দাবির মধ্যে অন্যতম আরও দুটো দাবি রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

এগুলো হলো—সংখ্যালঘুবিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় এবং সংখ্যালঘু কমিশন গঠন। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নবম জাতীয় সম্মেলন থেকে এসব দাবি জানানো হয়। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী এই ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন থেকে রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের নেতারা বলেন, জাতি-ধর্মের রোষানলে দেশ প্রায় ধ্বংসের পথে। আজ কেবল সংখ্যালঘুই আক্রান্ত নয়; মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতাও আক্রান্ত। সার্বিকভাবে গোটা বাংলাদেশই আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে সবাইকে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রক্ষায় সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে।'

এই দাবি তারা কার কাছে জানাল? সম্মেলনে রাজনৈতিক দলগুলো সবাই এসেছে জামায়াত আর বিএনপি ছাড়া। যারা এসেছে, তারা সংহতি জানিয়েছে। আওয়ামী লীগ তো ছিলই, জাতীয় পার্টিও সংহতি জানিয়েছে। তাহলে যারা আসেনি, তাদের কাছেই কি দাবি জানানো হচ্ছে? জামায়াত না হয় বুঝলাম তাদের অপছন্দের দল, কিন্তু বিএনপিকে কেন সম্মেলনে দাওয়াত দিলো না? এর যুক্তি কী? যুক্তি একটাই হতে পারে, এই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ গড়াই হয়েছে দল হিসেবে বিএনপিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর তো কোনো যুক্তি নেই।

তাদের দাবি নিয়ে তারা বলছে, হিন্দু নেতা নির্বাচন করবে হিন্দুরাই এবং হিন্দুরা মুসলমান নেতাকে নির্বাচিত করবে না। এর চেয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক কোনো দাবি হতে পারে! সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা নির্বাচন তো রিপাবলিকান রাষ্ট্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে তো বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রই থাকে না। আর তারা বলে—'মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রক্ষায় সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে!' এটা তো বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের বারোটা বাজানোর তরিকা। এই দাবি তো এটাই বলে, হিন্দু আর মুসলমান একসঙ্গে, এক রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। এই সর্বনাশা দাবি যেখানে তোলা হয়, সেখানে আমাদের বাম সেক্যুলাররা সবাই যায় আর সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেন আমাদের সো-কল্ড বুদ্ধিজীবী রেহমান সোবাহান।

https://nagorikpathagar.org

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে কে কথা বলবে

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন—আমি হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে কেন লিখি? আমি কি হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো পর্যায়ের নেতা?

আমার কোনো সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার খায়েশ নেই। আমি রাজনীতিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করি না, ভাগ করতে চাই না এবং করা ঠিকও মনে করি না। ফলে হিন্দু ইস্যুতে কথা বলার অধিকার কেবল হিন্দু নেতারই আর মুসলমানদের বিষয় কেবল মুসলমান নেতারই হতে হবে—এই ভাগ করাকে আমি বিপজ্জনক মনে করি। আমি সাম্প্রদায়িক মানুষ নই। কোনো সম্প্রদায়ের এমন 'নিজস্ব সংগঠন' থাকাই সাম্প্রদায়িক। সেটা যদি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের হয়, তাও সেটা সাম্প্রদায়িক। দেশের নাগরিক হিসেবে আমার চিন্তা ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার আছে। আর হিন্দু-মুসলিমের বিভেদাত্মক অবস্থা যদি দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে আরও সংকটে ফেলে; আর কেউ সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাইলে তাকে চুপ করে থাকতে বলাটা দুরভিসন্ধিমূলক।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় এক জটিল সময় অতিক্রম করছে। তাদের ওপর সহিংসতা বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি; তাতে সন্দেহ নেই। এখন এই সমস্যার সমাধান কী?

হিন্দুরা নিপীড়িত হিসেবে তাদের সংগঠন করেছে এবং তারা হিন্দু পরিচয়ের মধ্য থেকেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজছে। কারণ, তারা মনে করছে—হিন্দুদের যেকোনো সমস্যায় হিন্দুরাই পাশে দাঁড়াতে পারে। এই অনুমান সেক্টোরিয়ান অর্থে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদাত্মক এবং সর্বাংশে ভুল। এই কারণেই তারা বিভেদাত্মক একটি সংগ দিয়ে তাদের ওপর চলা বিভেদাত্মক নিপীড়নের কোনো সমাধান করতে পারছে না বা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তাদের সাত দফা দাবির প্রথম দাবিই হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক। তারা দাবি করেছে—সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণ করা এবং প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে ২০ শতাংশ সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের পদায়ন। এই কথার অর্থ হলো, তারা বাংলাদেশকে একটা একক রাষ্ট্র হিসেবে রেখে নাগরিক হিসেবে সমাধান চায় না। নাগরিক পরিচয় ভেঙে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দুদের জন্য রাষ্ট্রকে টুকরো টুকরো করে আলাদা হিস্যা চায়।

https://nagorikpathagar.org

ধর্মপরিচয় ছাড়াও সমাজে অসংখ্য বিভেদ থাকে। এই বিভেদের ওপরে উঠে আমরা এক পলিটিক্যাল কমিউনিটি তৈরি করি, যেটাকে রাষ্ট্র বলে। হিন্দু বা মুসলমানের রাষ্ট্রচিন্তায় যদি রাজনৈতিক বিভেদগুলোই প্রধান করে তোলা হয়, নিরসনে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় না থাকে, প্রস্তাব না থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে, রাষ্ট্র গঠনের গোড়ায় কোনো গলদ আছে। ফলে নতুন রাষ্ট্র সেখানে সম্ভব নয়। এমন কোনো রাষ্ট্র আগেই হয়ে থাকলে সেটা টিকবে না, তা আগেই বলা যায়।

রাষ্ট্র গঠন মানে রাজনৈতিক সমাজ তৈরি, যেই রাজনৈতিক সমাজে সকল নাগরিক তার সাম্প্রদায়িক পরিচয় নয়; নাগরিক পরিচয়ে অংশ নেবে। সেই রাজনৈতিক সমাজ বা পলিটিক্যাল কমিউনিটি বা রাষ্ট্র গঠনের কাজই আমাদের আশু কর্তব্য।

হিন্দু সম্প্রদায়কেও এই পলিটিক্যাল কমিউনিটি গড়ার কাজে অন্য সকলের সঙ্গে মিলে অংশগ্রহণ করতে হবে। পলিটিক্যাল কমিউনিটি বিষয়টার রাজনৈতিক ও সামাজিক গভীরতা বুঝে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি তার নাগরিক পরিচয়কে মুখ্য করতে হবে বা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

'আমরা হিন্দু, আমাদের ওপর মুসলমানরা অবিচার করছে'—এমন ভাষায় অভিযোগ কেউ করতেই পারে। কিন্তু আমি হিন্দু হিসেবে এর সমাধান হিন্দু কায়দায় চাই, হিন্দুদের আলাদা কোটায় চাই—এভাবে আমরা বলতে পারি না। এভাবে বললে তখন সেই নালিশ সাম্প্রদয়িক বা বিভেদমূলক নালিশ হবে এবং প্রত্যাশিত সমাধান হবে সাম্প্রদায়িক সমাধান। এর উদ্দেশ্য যাই হোক, পরিণাম ভালো হয় না। কারণ, এই ধারার নালিশের মানসিকতাটাই বিভেদাত্মক। অথচ বাস্তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল নালিশ ও অভিযোগ এই অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে। এই অবস্থান কোনো সমাধান দিতে পারবে না; এমনকী পারছেও না। অবাক বিষয় হচ্ছে, নিজেদের সমস্যার সাম্প্রদায়িক সমাধান চাইলেও তারা চায় একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক সমাধান দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কীভাবে সম্ভব হতে পারে তা বোধগম্য নয়।

হিন্দু সম্প্রদায়কে বলতে হবে—'আমি এই দেশের নাগরিক এবং আমরা এমন একটা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই, যেই রাষ্ট্রে বিভেদাত্মক আচরণের শিকার হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।'

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় কি এই জরুরি কাজ করতে রাজি আছে?

https://nagorikpathagar.org

বিচার মানি তালগাছ আমার

'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ' মনে করে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে গেছেন। যদিও কোনোদিন তারা স্পষ্ট করে বলেননি, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের চরিত্রে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমি তাদের কনসার্ন আমলে নেওয়ার পক্ষে। তারা বলেন, ৭২-এর সংবিধান অবিকৃতভাবে পুনর্বহাল করতে হবে। যেই সংবিধানের ভিত্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সেই সংবিধান যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সকলকে এক খোঁচায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে দেয়, সেটা তাদের নজরে আসে না। বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি, নিছক পোশাকি রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা নয়; যেই রাষ্ট্রধর্ম ইংল্যান্ডেও আছে। তাদের ভাবখানা এমন—'আমার হিস্যা ঠিক থাকলেই সহিহ।'

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার ও নালন্দা

বখতিয়ার খিলজি এবং নালন্দা ধ্বংস-১

বখতিয়ার খিলজি নালন্দা ধ্বংস করেছিলেন কোনো সন্দেহ নেই। ঘটনা ঘটেছিল ভুল করে। বিহার ধ্বংস করার পর বখতিয়ার জানতে পারেন, এটা দুর্গ নয়; বিদ্যাপীঠ। কিন্তু সর্বনাশ যা হওয়ার সেটা আগেই হয়ে গেছে। নালন্দা ধ্বংস বৌদ্ধ ধর্মের ওপর বিদ্বেষপ্রসূত করা হয়নি। সেটা হলে অধিকৃত অঞ্চলে অন্য বিহারগুলোও ধ্বংস হতো আর বৌদ্ধরাও দলে দলে মুসলমান হতো না। মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ শ্রমণরা যখন মুসলমান হয়েছে, তখনই এসব নেড়ে-মাথার মুসলমানদের দেখে 'নেড়ে' গালিটির উদ্ভব হয়েছে।

যে বিষয়টি কখনো আলোতে আসে না সেটা হচ্ছে, বৌদ্ধদের দেশছাড়া করেছে কারা? কারা বৌদ্ধদের শুধু বৌদ্ধ হওয়ার কারণে নির্মম অত্যাচার আর গণহত্যা চালিয়েছে? ইতিহাস সাক্ষী, রাজা শশাঙ্ক আর সেন রাজারা এ দুষ্কর্ম করেছে। রাজা শশাঙ্ক তো বোধি বৃক্ষ উপড়ে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। বোধি বৃক্ষ হলো সেই বৃক্ষ, যার নিচে ধ্যান করে গৌতম বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শশাঙ্ক প্যাগোডা ধ্বংস করে মন্দির বানিয়েছিল। শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের ঘটনা হিউয়েন সাং লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বখতিয়ারের নামটা যদি আর্য হতো, তাহলে নালন্দার কাহিনি কবেই আমাদের প্রগতিশীলরা ভুলিয়ে দিতেন, যেভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলা থেকে বৌদ্ধ বিতাড়নের নির্মম ইতিহাস।

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার খিলজি এবং নালন্দা ধ্বংস-২

বখতিয়ার খিলজি 'ভুল করে নালন্দা ধ্বংস করেছিলেন'—এটা বলায় অনেকের গায়ে ফোঁসকা পড়েছে। ফোঁসকা পড়ার অবশ্য আরও কারণ আছে। কেননা, আমি বৌদ্ধ নিগ্রহ এবং তাদের দেশান্তরী করার জন্য রাজা শশাঙ্ক ও সেন রাজাদের অভিযুক্ত করেছি।

আসলে নালন্দা ধ্বংস হয় সর্বোমোট তিনবার। এর মধ্যে প্রথমবার করে মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধবাজ হানরা, দ্বিতীয়বার স্বয়ং রাজা শশাঙ্ক এবং শেষবার বখতিয়ার খিলজি। নালন্দাকে প্রথম দুবার ধ্বংসস্তূপ থেকে দাঁড় করানো গেলেও তৃতীয়বার সম্ভব হয়নি।

ইতিহাসের যেকোনো বই পড়লে বখতিয়ারের ভুল করে বিহার ধ্বংসের কথা দেখতে পাওয়া যায়। আমি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত অতিনির্ভরযোগ্য একটি ইতিহাস বই থেকে উদ্ধৃত করছি। বলাই বাহুল্য এটা মুসলিম ইতিহাসবিদদের লেখা নয়।

মিনহাজ মগধ ও গৌড় জয়ের যে ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন, তার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হলো—

> 'মহম্মদ বখতিয়ার নামক খিলজি বংশীয় একজন তুরস্ক সেনানায়ক উপযুক্ত কর্মানুসন্ধানে মহম্মদ ঘোরি ও কুতুবুদ্দিনের নিকট গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে অযোধ্যায় মালিক হুসামুদ্দিনের অনুগ্রহে চুনারগড়ের নিকট দুইটি পরগণা জায়গীরপ্রাপ্ত হন। এখান হইতে বখতিয়ার দুই বৎসর যাবৎ মগধের নানাস্থান লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অবশেষে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া "কিল্লা বিহার" অধিকার করেন। ইহার মুণ্ডিত মস্তক অধিবাসীদিগকে নিহত ও বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠন করার পরে আক্রমণকারীগণ জানিতে পারিলেন যে, ইহা বস্তুত "কিল্লা" বা দুর্গ নহে, একটি বিদ্যালয় মাত্র এবং হিন্দুর ভাষায় ইহাকে "বিহার" বলে।'

ইতিহাস না পড়ে শুধু শুনে শুনে ইতিহাস জানবেন আর বিদ্বেষ ছড়াবেন তা হয় না।[১৬]

---

১৬. বাংলাদেশের ইতিহাস; শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিসার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা, কলিকাতা, প্রকাশকাল : পৌষ ১৩৫২, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৮

https://nagorikpathagar.org

নালন্দা কি বখতিয়ারের আক্রমণেই ধ্বংস হয়েছিল

নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। কারণ, বখতিয়ার খিলজিসংক্রান্ত সকল তথ্যই মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা। মিনহাজ বখতিয়ারের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর বাংলায় গিয়ে বাংলা বিজয়ের যে কাহিনি শুনেছিলেন, মূলত তাই লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি মূলত প্রচলিত কাহিনিগুলোকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা ঐতিহাসিকদের কাছে বাংলা জয়ের একমাত্র দলিল। তাই মিনহাজের সব কথাই যে সঠিক, তা না-ও হতে পারে, এটাই ঐতিহাসিকদের মত ছিল।

ধরমসাভমিন নামের এক বৌদ্ধ সাধক যে সময় মিনহাজউদ্দিন বাংলায় এসেছিলেন, তার ৮ বছর আগে এবং কথিত বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংসের ৩১ বছর পরে নালন্দায় এসেছিলেন। তিনি নিজে কিছু লিখেননি, কিন্তু তার বয়ানের ওপর ভিত্তি করে তার জীবনী লেখা হয় তিব্বতে *Biography of Dharmasvamin* নামে। জর্জ রোয়েরিখ মূল তিব্বতি থেকে ইংরেজিতে সেই বই অনুবাদ করেন। পাটনার কে পি জসওয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট সেটি ছাপে ১৯৫৯ সালে। সেখানে লেখা আছে, ধরমসাভমিন কথিত নালন্দা ধ্বংসের ৩১ বছর পরে নালন্দায় এক বছর লেখাপড়া করেন। সেই সময়ে ৭০ জন আচার্য নালন্দায় বাস করতেন।

নালন্দা যদি বখতিয়ার ধ্বংসই করে থাকবেন, তবে তার মৃত্যুর পরও কীভাবে নালন্দায় লেখাপড়া করা সম্ভব হয়?

বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংসের মিথ

'সোনার বাংলার রূপালি কথা' লেখার সময় বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংসের মিথ কীভাবে উপস্থাপন করব ভাবছিলাম। অনেক রেফারেন্স বই ঘেঁটে যেটা পেলাম তা হচ্ছে, বখতিয়ার দুর্গ ভেবে ভুল করে নালন্দা আক্রমণ করেছিল। এই সিদ্ধান্ত কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদের নয়; বরং মুসলমানদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ রুষ্ট ঢাবির সাবেক ভিসি আর সি মজুমদারের। পরে ধরমাসাভিনের লেখায় জানলাম যে, তিনি কথিত নালন্দা ধ্বংসের অনেক পরে নালন্দাতে পড়তে গিয়েছিলেন। ফলে এটা অনুমান অসংগত নয় যে,

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার সম্ভবত নালন্দা বিহার আংশিক ধ্বংস করেছিলেন এবং বখতিয়ারের আক্রমণের পরেও নালন্দা আংশিক হলেও পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো, বখতিয়ারের মতো এমন দক্ষ সেনাপতি কেন এমন ভুল করলেন? তিনি কেন দুর্গ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বুঝতে পারলেন না? তার উত্তর হচ্ছে, আর্যরা আর্যাবর্তের বাইরে অর্থাৎ উত্তর ভারতের বাইরে সকল ধর্মস্থানে আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করত। তাই ধর্মস্থান এবং বিহার দুর্গের মতো করে তৈরি করা হতো। এমনকী সব বিহারের চারপাশে পরিখা থাকারও প্রমাণ রয়েছে। কহলনের *রাজতরঙ্গিনী*-তে হিন্দু রাজাদের মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস রচিত আছে। তাই বিহারকে দুর্গ ভেবে ভুল করাটা বহিরাগত বখতিয়ারের জন্য অসংগত নয়।

আরেকটি প্রশ্ন হলো—এই নালন্দা ধ্বংস নিয়ে সেক্যুলাররা কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু আমাদের পাহাড়পুর যেটা ছিল সোমপুর বিহার আর ময়নামতি, যেটা ছিল শালবন বিহার, সেগুলো কে ধ্বংস করেছিল?

ময়নামতি ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণদের হাতে আর সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর ধ্বংস হয় পরম বিষ্ণুভক্ত হিন্দু রাজা জাতবর্মার হাতে। ব্রাহ্মণ আর জাতবর্মারা কিন্তু ভুল করে বিহার ধ্বংস করেননি; জেনে-শুনেই করেছিলেন। তারা জানতেন এটা দুর্গ নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কারণ, তারা তো আর বহিরাগত ছিলেন না। সে কারণেই সেক্যুলার কবিরা ময়নামতি আর পাহাড়পুর ধ্বংস নিয়ে নীরব।[১৭]

[১৭]. ভারতবর্ষ ও ইসলাম; সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্য প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ২৯

https://nagorikpathagar.org

রাশিয়া ও ইসলাম

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম

বাংলাদেশে যারা এক সময়ের রুশপন্থি ছিলেন, তাদের মধ্যে ধর্মের বিষয়ে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে এক ধরনের বিরাগ আছে। অথচ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেই এমনকী কমিউনিস্ট শাসনামলে ইসলাম ধর্মের চর্চা বাধাহীন ছিল। এমনকী রাষ্ট্রীয়ভাবে গঠিত চারটি মুসলিম বোর্ড ইসলামি বিষয়ে দেশব্যাপী শিক্ষা ও ধর্মীয় জীবনের নানা বিষয়ের দায়িত্ব পালন করত। এমনকী সেখান থেকে ফতোয়াও আসত, যা রাষ্ট্রীয়ভাবেও মেনে চলার বাধ্যবাধকতা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা বিশ্বখ্যাত মাদরাসাও ছিল, নাম 'মির আরব' মাদরাসা। এই মাদরাসা এখনও আছে। মির আরব পুরোনো মাদরাসা হলেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট জামানায় রাষ্ট্রীয় খরচে ইসলামি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইমাম আল বুখারি ইসলামিক ইনস্টিটিউট গঠিত হয়।

খোদ লেনিনের সঙ্গে রাশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ সুখস্মৃতি আছে। খলিফা উসমানের সময় তৃতীয় ও শেষবারের মতো পবিত্র কুরআন শরিফ সংকলিত হয়। তিনি এই সংকলনের পাঁচটি কপি পাঁচ জায়গায় রাখেন। এর মধ্যে এক কপি ছিল সমরখন্দে। তা নানা হাত ঘুরে জারের হাতে এসে পড়ে এবং তিনি সেটা সেইন্ট পিটার্সবার্গের রাজকীয় গ্রন্থাগারে রাখেন। জারের কাছে মুসলমানরা নানা সময় কুরআনের শরিফটি তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে চাইলেও সেটি ফেরত দেওয়া হয় না। এমনকী জারের পতনের পর মেনশেভিক কেরেনেস্কি সরকারের কাছেও চাওয়া হলেও।

https://nagorikpathagar.org

কেরেনেস্কি তা পাত্তা দেননি। রুশ বিপ্লবের পর মুসলমান সম্প্রদায় সরাসরি লেনিনের সঙ্গে দেখা করে কুরআন শরিফটি ফেরত দেওয়ার আবেদন জানায়। লেনিন তৎক্ষণাৎ রাজি হন এবং শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কির কাছে একটা চিঠি লিখেন। চিঠির ভাষা ও বাক্যগঠন লক্ষ করুন—

> 'জনকমিশারদের পরিষদ পেত্রোগ্রাদের (সেইন্ট পিটার্সবার্গ) জাতীয় এলাকার আঞ্চলিক মুসলিম কংগ্রেসের নিকট থেকে একটি অনুরোধ পেয়েছে। এতে রাশিয়ার সকল মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সাধারণ পাঠাগারে (বিপ্লবের পরে রাজকীয় গ্রন্থাগারের পরিবর্তিত নাম) রক্ষিত "উসমানের পবিত্র কুরআনটি" মুসলমানদের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছে। জনকমিশারদের পরিষদ এই ডিক্রি জারি করে যে, বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত "হজরত উসমানের পবিত্র কুরআনটি" অতঃপর স্থানীয় মুসলিম কংগ্রেসের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং তদানুযায়ী আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি জারি করার অনুরোধ জানাচ্ছি।
>
> ভ ই লেনিন
> জন কমিশারের সভাপতি'

এই কুরআন শরিফটি বর্তমানে তার আদি অবস্থান সমরখন্দেই আছে।

এই গল্পের উদ্দেশ্য এটা দেখানো নয় যে, সোভিয়েত কমিউনিস্টরা ধর্মের বিষয়ে জুলুম করেনি। স্ট্যালিন আমলে অনেক জুলুম হয়েছে ধর্মের ওপরে, কিন্তু লেনিন নিজে খেয়ে না খেয়ে ধর্মের বিরোধিতা করাটা অপছন্দ করতেন। তার চিঠির ভাষায় এটা পরিষ্কার। তিনি নিজে হয়তো ধর্ম মানতেন না, কিন্তু ধর্মে তিনি সম্মান করতেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প হলো—

> 'আমাদের দেশের আবু জাফর শামসুদ্দিন গেছেন সোভিয়েত ভ্রমণে। তার সঙ্গী ছিলেন শ্রীলংকার এক সাবেক মন্ত্রী বদিউদ্দিন আহমেদ। বদিউদ্দিন সাহেব ছিলেন আলীগড়ের গ্র্যাজুয়েট এবং প্র্যাক্টিসিং মুসলিম। তিনি সোভিয়েত রাশিয়াতেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। তাদের একজন গাইড ছিল রুশ তরুণী। বদিউদ্দিন সাহেব সেই তরুণীকে জিজ্ঞেস করেন—"তুমি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?"

https://nagorikpathagar.org

তরুণী বলে "হ্যাঁ।" বদিউদ্দিন সাহেব আবার প্রশ্ন করেন—"তুমি কি আল্লাহ মানো?" তরুণী একটুও না চমকে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।" সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মানেই নাস্তিক বা নাস্তিক না হলে পার্টির সদস্য হওয়া যাবে না, এটা সর্বাংশে সত্য নয়।'[১৮]

রাশিয়ার বিপ্লব এবং মুসলিম মননে তার প্রভাব

রাশিয়াতে বিপ্লব হয়েছে। বিপ্লবীদের লাল ফৌজ আর প্রতিবিপ্লবীদের শ্বেতবাহিনী। শ্বেতবাহিনী নবসৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। এই শ্বেতবাহিনীতে যোগ দিয়েছে নানা দেশের সেনারা। ভারত থেকে শ্বেতবাহিনীর হয়ে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে ট্রান্স ককেশাস অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশরাজ কয়েক রেজিমেন্ট সেনা পাঠিয়েছে।

এই রেজিমেন্টের একটা বড়ো অংশ ছিল মুসলমান সৈনিক। তারা সেখানে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ও সাম্যের সমাজের কথা শুনে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। শুধু তাই নয়, এই রেজিমেন্টগুলোর একাংশ বিদ্রোহ করে লাল ফৌজে যোগ দেয়।

এমন একজন বিদ্রোহী সেনা ছিলেন মুর্তাজা আলি। তিনি নিকোলাই গিগালোর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই বীর যোদ্ধা শ্বেতবাহিনীর জন্য ছিলেন খুবই ভয়ংকর। তার নামে শ্বেতবাহিনীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হতো। অসংখ্য সফল গেরিলা অপারেশনের পর একটা গেরিলা অপারেশনের সময় তিনি রণক্ষেত্রেই শহিদ হন।

নিকোলাই গিগালোর বোন ভেরা গিকালো ককেসাস যুদ্ধে মুর্তাজা আলির গেরিলা দলে ছিলেন। তিনি লিখেছেন—'আজকাল সোভিয়েত ও ভারতীয় জনগণের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আমি যখন মর্মস্পর্শী অনেক কথা পড়ি, তখন আমার চিন্তার জগতে জাগরুক হয়ে উঠে সেই নম্র, সাহসী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী যোদ্ধাদের কথা। সংখ্যায় তারা কম ছিলেন, কিন্তু সাহসী মুর্তাজা আলির মতো জনগণের মুক্তির খাতিরে তারা নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা করতেন না।'

---

১৮. সোভিয়েত দেশে মুসলিম জীবন; আবু জাফর শামসুদ্দিন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬, ২৭-২৯, ৩০-৩২

https://nagorikpathagar.org

ঠিক এই সময়েই কাজী নজরুল ইসলাম করাচিতে সেনা ক্যাম্পে ছিলেন। মুর্তাজা আলির গল্প তাঁকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মুর্তাজা আলির গল্পকে উপলক্ষ্য করে বেলুচিস্তানের পটভূমিকায় লিখেন 'ব্যথার দান'। তাঁর এই উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেম, দারা আর সয়ফুল মুলক; দুজনেই ভালোবাসে বেদৌরাকে। দারা লাল ফৌজে যোগ দেয়। সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে করতে দারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এই দারার চরিত্রটি তিনি লিখেছিলেন অজেয় যোদ্ধা মুর্তাজা আলির স্মরণে।

যেই সাম্যের আদর্শের প্রতি এই অঞ্চলের মুসলমানরা স্বভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হতো, সেই ধর্মসম্প্রদায় কেন সমাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিপক্ষ ভাবে, সেই শ্লোক সন্ধানের দায় এই যুগের বামপন্থিদের। তারা কি একবার আত্মানুসন্ধান করবেন?

https://nagorikpathagar.org

মৌলবাদ

মৌলবাদ শব্দটা যেভাবে এলো

কিছুদিন আগে দাওয়াত পেয়ে এক বন্ধুর বাসায় গেলাম। তখন সারা দেশের হট টপিক ছিল 'কাশেম বিন আবু বাকার'। তখন সেই বন্ধুর বাসায় আলাপ চলছিল কাশেম সাহেবকে নিয়েই। আমি বলছিলাম, কাশেম সাহেব পুরোদস্তুর মর্ডানিস্ট। এই আলাপটা যখন এগোচ্ছে, তখন হুট করে একজন এসে বলে বসলেন, 'আপনি হচ্ছেন মৌলবাদী'। লোকটাকে আমি চিনতাম না, হঠাৎ তার লেখা আমার নিউজফিডে এলো। দেখলাম, এই লোকটা তো সেই লোক। তার পরিচয়ও দেখলাম, আমার সেই বন্ধুর প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করেন।

তার চেহারাটা নিউজফিডে দেখে আমাকে দেওয়া সেই মৌলবাদী অভিধার কথা মনে হতেই হাসি পেল।

তিনি না জানতেই পারেন যে, 'মৌলবাদ' তত্ত্বটাই একটা আমেরিকান তত্ত্ব। এর উদ্ভব ও বিকাশ আমেরিকান সমাজেই। এমনকী আমেরিকা রাষ্ট্র গঠনেও মৌলবাদের ভূমিকা আছে বলে অ্যাকাডেমিশিয়ানদের অনেকেই মনে করেন।

এই শব্দটার জন্ম দেয় আমেরিকার মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউট এবং তার ভাবাদর্শের অনুসারী নায়াগ্রা বাইবেল কনফারেন্স। মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউটের মূল কথা ছিল বাইবেলকে অভ্রান্ত ধরে নিতে হবে, তার কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে না। পরবর্তী সময়ে ১৮৯৫ সালে নায়াগ্রা বাইবেল কনফারেন্স বাইবেলের পাঁচটি মূল সূত্রকে খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাসের ফান্ডামেন্টাল বলে ঘোষণা করে। এগুলো হচ্ছে—

https://nagorikpathagar.org

১. বাইবেল অভ্রান্ত
২. খ্রিষ্ট দিব্যরূপে পূজ্য
৩. মাতা মেরির কৌমার্য ধ্রুব সত্য
৪. খ্রিষ্টের অপসরণ বিকল্পমূলক
৫. খ্রিষ্টের সশরীর পুনরাবির্ভাব আসন্ন

এই পাঁচটি মূল সূত্রকে ব্যাখ্যা করে ১৯০৯ সালে ডিকশন ও টোরের সম্পাদনায় বারো খণ্ডের বই প্রকাশিত হয়। নাম—*দ্যা ফান্ডামেন্টালস : এ টেস্টিমনি টু দ্যা ট্রুথ*। এরপর থেকেই এই নতুন ধারার খ্রিষ্টবাদীদের ফান্ডামেন্টালিস্ট এবং তাদের মতবাদকে ফান্ডামেন্টালিজম বলা হয়।

এই ডিকশন ও টোরেই পরে ঘোষণা করেন, আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের ধর্মীয় আদর্শই আমেরিকার ভাবাদর্শ। তারা বলেন—

'America was founded by men of faith on Godly principles.'

এই গডলি প্রিন্সিপল বা ঐশ্বরিক নীতিই হচ্ছে সেই পাঁচটা মৌল আদর্শ, যা *দ্যা ফান্ডামেন্টাল* গ্রন্থে বলা হয়েছে।

আমেরিকান ভ্যালুজ বা আমেরিকান ওয়ে অব লাইফ বলতে যা বোঝায়, তা আসলে পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের কালচারাল ফর্ম বা সাংস্কৃতিক রূপ, আর তা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানিজম ছাড়া আর কিছুই না। মার্কিন ধনতন্ত্র আর খ্রিষ্টধর্ম পরস্পরের হাত ধরে চলে। এই ক্যাপিটালিজমের টিকি বাঁধা আছে ওই পাঁচটা ফান্ডামেন্টালে। তাই আমেরিকান জীবন ও মূল্যবোধ মৌলবাদী বটেই।

মৌলবাদী কে

মৌলবাদী কে? মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা কি আবশ্যক? আমাদের দেশের একধরনের মানুষের ধারণা, মৌলবাদ শুধু ধর্মের বিষয়। পৃথিবীতে যেকোনো আদর্শকে ঘিরে মৌলবাদ-সহিংসতা জন্ম নিতে পারে। শুধু নিতে পারে বললেও ভুল হবে। মৌলবাদ ও সহিংসতার উত্থানের উৎস হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মও মুক্ত নয়, সমাজতন্ত্রও মুক্ত নয়। যখন কেউ বলে 'সমাজতন্ত্র অভ্রান্ত',

https://nagorikpathagar.org

এটাই হয়ে উঠে মৌলবাদ। আর যখন বলা হয়, 'সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের নিয়তি' তখন এটা হয়ে উঠে নিয়তিবাদ। আদর্শ মানে জীবনের কমপ্লিট কোড, এর বাইরে কোনো সত্য নেই। 'আদর্শ' মানে অতিন্দ্রীয় শুদ্ধ ধারণা—যা শ্রেষ্ঠ। তাই আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয়। শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যদি রক্তপাতের প্রয়োজন হয়, আদর্শের অনুসারীরা সেটা করতে পিছপা হন না। আদর্শই মূল্যবান—এই প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে আদর্শের নিচে ফেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আদর্শের কোনো গ্লানি নেই। আদর্শবাদীর কাছে আদর্শের মূল্য আছে, মানুষের নেই।

ধর্মবাদীদের কাছে মানুষের চেয়ে ধর্ম বড়ো হয়ে উঠলেই ধর্মের নামে মানুষ খুন করে ফেলে অবলীলায়। মানুষের চেয়ে জাত বড়ো হয়ে উঠলেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে হিটলার মানুষ পোড়ায়। মানুষের চেয়ে সমাজতন্ত্র বড়ো হয়ে উঠলেই খেমার রুজের মতো হিংস্র দানব গণহত্যায় মেতে ওঠে। মানুষের চেয়ে দল বড়ো হয়ে উঠলেই দলের অনুসারীদের দল রক্ষায় হয়ে উঠতে হয় হিংস্র, মৃত্যুক্ষুধায় তড়পাতে থাকা পিশাচ, রক্তের নেশায় ঘুরতে থাকা ভ্যাম্পায়ার; অন্ধকারেই যার জীবন শুরু।

এখন সময় অন্ধকারের! তাই অন্ধকারের শক্তিরা 'আদর্শ' দেখে।

আলোর দিশারিরা মানুষ দেখে, শুধু মানুষ।

মৌলবাদ বলতে কী বোঝায়

'মৌলবাদ' বলতে কী বোঝায়? এর কোনো ওয়ার্কিং ডেফিনেশন আছে কি না, সেটা জানতে মোটামুটি বাংলা আর ইংরেজি মিলিয়ে ছয়টা বই চষে ফেললাম। বইগুলোর কভারে মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম লেখা ছিল। হতাশ হলাম, কোথাও মৌলবাদ শব্দটির ওয়ার্কিং ডেফিনেশন নেই। কোনো বইয়ের কভারে মৌলবাদ লেখা থাকলেই সেখানে সংজ্ঞা থাকা উচিত কি না, সেই তর্ক কেউ তুলতেই পারেন। আমি মূলত বইগুলো যখন কিনেছি, তখন দোকানের ক্যাটালগ দেখে শিরোনামে 'মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম' লেখা আছে এমন ছয়টা বই পেয়েছিলাম। সবগুলোই কিনেছিলাম সেদিন।

https://nagorikpathagar.org

শেষে ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচারে খুঁজে পেলাম সেই ওয়ার্কিং ডেফিনেশন।

> 'The demand for a strict adherence to certain theological doctrines, in reaction against Modernist theology.'
> 'আধুনিক ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোর প্রতি কঠোর আনুগত্যের জন্য দাবি।'

'মর্ডানিস্ট থিওলজি' বা আধুনিক ধর্মতত্ত্বের উল্লেখটা লক্ষণীয়। মৌলবাদের সংগ্রাম ধর্মের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যেখানে একপক্ষ ধর্মকে আধুনিকায়নের নামে বদলে দিতে চায়, আরেক পক্ষ সেটাকে প্রতিরোধ করে।

মৌলবাদের সংগ্রাম তাই প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে নয়; মৌলবাদের সংগ্রাম 'মর্ডানিস্ট থিওলজি'র বিরুদ্ধে। আর এই 'মর্ডানিস্ট থিওলজি' হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের সন্তান।

মর্ডানিস্ট থিওলজির জন্ম পুঁজিবাদের হাত ধরে, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি শোভন সম্পর্ককে খতম করে দেওয়া। মার্ক্স তাই কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে লিখেছিলেন—'বুর্জোয়া শ্রেণির যখনই ক্ষমতা হয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সম্পর্কে মানুষ বাধা ছিল তার উপরওয়ালাদের কাছে, তা তারা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে।'

https://nagorikpathagar.org

কমিউনিস্ট দলগুলোর সমস্যা

ভারতীয় কমিউনিস্টদের বর্ণবাদিতা

'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একজন মন্ত্রী একবার এই রাজ্যের একটি বিশিষ্ট কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন সেখানে জড়ো হওয়া সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি তো কমিউনিস্ট, অথচ দেবী মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন?'

উনি উত্তরে বলেছিলেন—'আমার প্রথম পরিচয় আমি ব্রাহ্মণ এবং আমার দ্বিতীয় পরিচয় আমি কমিউনিস্ট।'[১৯]

একজন কমিউনিস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারেন, তার ধর্ম পালন করতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কমিউনিস্টরা কি বর্ণবাদী হতে পারেন? জন্মসূত্রে পাওয়া উচ্চবর্ণের অহংকার তো নিরেট রেইসিজম বা বর্ণবাদ।

কমিউনিস্টরা চায় 'শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজ' উচ্ছেদ করে 'সাম্যের সমাজ' গড়তে। যেখানে জাতপাত, অর্থনৈতিক অসাম্য থাকবে না। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা থেকে উদ্ভূত উচ্চবর্ণের জন্মসূত্রে পাওয়া ব্রাহ্মণ পরিচয় তো পুঁজিবাদের বুর্জোয়া পরিচয়ের চেয়ে পশ্চাৎপদ। আপনি পুঁজিবাদে অর্থবিত্তের মালিক হতে পারলে জন্মসূত্রে পাওয়া পশ্চাৎপদ অবস্থাকে আপনি উতরে যেতে পারেন, কিন্তু বর্ণাশ্রমে সেটার সুযোগই নেই।

---

১৯. আমার জীবন কিছু কথা; কান্তি বিশ্বাস (তিনি সিপিএমের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘদিন), একুশ শতক, কোলকাতা, অক্টোবর ২১০৪, পৃষ্ঠা : ১৩২

https://nagorikpathagar.org

আপনাকে ধরে নিতে হবে তিনি যেহেতু ব্রাহ্মণ, তাই তিনিই আপনার চেয়ে উন্নত মানুষ। সেই পশ্চাৎপদ বর্ণাশ্রমের ব্রাহ্মণ পরিচয় একজন কমিউনিস্টের পরিচয়ের সাথে কোনোভাবেই মিলবে না; এটা সাংঘর্ষিক। অথচ তিনি কী বিপুল গৌরবে তার কমিউনিস্ট এবং ব্রাহ্মণ—দুই পরিচয়কেই ধরতে চান। তিনি দুধ আর তামাক একসাথেই খাবেন!

কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ চায়নি সিপিবিও

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ, শেরে-বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি, সোহরাওয়ার্দী, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), খেলাফত রব্বানী পার্টি একসঙ্গে ঐক্য গড়ে নির্বাচন করে। এই ফ্রন্ট হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিতি পায়।

যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। সিপিবি এই বিজয়ের গল্প এখনও বলে বেড়াচ্ছে।

আমার আলোচনার বিষয় সেটা নয়। এই যুক্তফ্রন্টের একটা সর্বসম্মত ঘোষণা ছিল, যার নাম ছিল '২১ দফা'।

এই ২১ দফা প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে। এই ২১ দফার নীতি কি ছিল জানেন? ২১ দফার প্রথমেই সেটা লেখা ছিল, যেখানে 'সিপিবি' একমত হয়েছিল। আজ অবাক হবেন সেই নীতি পড়ে।

২১ দফার নীতি : কুরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।[২০]

---

২০. বাংলাদেশের রাজনীতি প্রকৃতি ও প্রবণতা : ২১ দফা থেকে ৫ দফা; সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা : ১২৭

https://nagorikpathagar.org

সিপিবি কি একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল

ইংরেজিতে 'প্রোগ্রেসিভ'-এর বাংলা করে আমরা বলি 'প্রগতিশীল'। বাংলাদেশের সকল বামপন্থি নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করে। আসলে প্রোগ্রেসিভ মানে কী? রাজনীতিতে প্রোগ্রেসিভ মানে—যারা গ্রাজুয়ালি সোশ্যাল রিফর্মের পক্ষে। প্রোগ্রেসিভরা বিপ্লব করে সামাজিক পরিবর্তন চায় না। তারা বিপ্লবী নয়। রুজভেল্ট, ওবামা, ক্যামেরন—সবাই নিজেকে প্রোগ্রেসিভ বলে দাবি করেন। ব্রিটেনের লেবার পার্টি নিজেদের সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেত, তাই তারাও একসময় নিজেদের প্রোগ্রেসিভ বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করেন। পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রেসিভ আন্দোলন হয় ইউরোপে হেগেলের অনুসারীদের মাধ্যমে। প্রগতিশীলতা সর্বতোভাবেই একটি বুর্জোয়া ধারণা। পাশ্চাত্যে প্রগতিশীল রাজনীতির যে চারটি স্তম্ভ আছে বলে বলা হয়, তা হচ্ছে– ফ্রিডম, অপর্চুনিটি, রেস্পন্সিবিলিটি এবং কো-অপারেশন। প্রগতিশীলতার এই আধুনিক ধারণা আসে আমেরিকা থেকে। আমেরিকান ভ্যালু প্রজেক্ট অনেক খরচ করে সেই প্রজেক্ট থেকে *Progressive Thinking: A Synthesis of Progressive Values, Beliefs, and Positions* নামে বই প্রকাশ করে। সেই বইয়ে পাশ্চাত্য প্রগতিশীলতার উপরোক্ত সংজ্ঞায়ন করা হয়।

সিপিবি তাদের ঘোষিত লক্ষ্য বিচারে একটি বিপ্লবী দল। তারা শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বাংলাদেশে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আশু কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেন। সবগুলোই তো বিপ্লবী কর্তব্য; এখানে সামাজিক রিফর্মের স্থান কোথায়? তাহলে নিজেদের বিপ্লবী না বলে প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করার কারণ কী? এটা কি লেবার পার্টির মতো রিডেফিনেশন?

ঘটনাটা বোঝা যায় তার একটা মন্তব্যে। তিনি আমাকে লক্ষ করে লিখেন—

> 'আমি ভালো করেই জানি আমার শত্রু কে? দেশদ্রোহী রাজাকার, জামায়াত-শিবির তথা ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমার শত্রু। আমার যা কিছু কর্মকাণ্ড, তা এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।'

পৃথিবীতে এমন কোনো কমিউনিস্ট নেই, যারা শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দেশীয় দোসর লুটেরা বুর্জোয়াদের ঘোষণা করেনি। কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল হওয়ার কারণে শ্রমিকশ্রেণির সাপেক্ষে তার শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করে। বড়োই দুঃখ হয়, যখন সিপিবি'র শিক্ষায় শিক্ষিত একজন এভাবে তার শত্রু ঘোষণা করে।

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতায় সিপিবি

মাওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'-এর দাবি উত্থাপন করেন।

ভাসানীর এই দাবিকে সিপিবি সমালোচনা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একমাস আগে ১৯৭১-এর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে সিপিবি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি) ৫ দফা দাবি তোলে। তার তৃতীয় দফায় তিনি লিখেন—

> 'জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙালিবিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে।'

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর একমাস আগে যখন গোটা জাতি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছে, তখন সিপিবি'র এই বিপ্লবী (!) বয়ানের ব্যাখ্যা কী?[২১]

বাংলাদেশের বামপন্থিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান

বাংলাদেশের বামপন্থিরা বলেন, তাদের নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক অবদান ছিল। প্রখ্যাত বামপন্থি নেতা নির্মল সেন বামপন্থিদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান নিয়ে মূল্যায়ন করেছিলেন—

> '৭১-এর সংগ্রামে আমাদের তেমন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। আমরা আমাদের শ্রমিকদের ৭১-এর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম কি? আদৌ নয়। আমি ইতিঃপূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। এ ব্যাপারে তখনকার বিভিন্ন আত্মগোপনকারী বামপন্থি দলসহ ছাত্রলীগের নেতারাও আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আমরা বারবারই বলেছি, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা আমরা জানতে চাই। আর আমরা আরেকটা পাকিস্তান গড়তে চাই না। আমরা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ চাই। এ কথায় আমাদের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে গেছে।

---

২১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৫৩-৫৪

https://nagorikpathagar.org

আমাদের ভূমিকা ওই পর্যন্তই। এরপরে আমরা দেশ স্বাধীন করার নিজস্ব কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছি। ১৯৭১ সালে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছি। আমার জানা মতে, এটাই ছিল মোটামুটিভাবে বামপন্থিদের ভূমিকা।'[২২]

হিন্দু মহাসভার বয়ান কেন মণি সিংহের মুখে

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা আমরা জানি। ওই দিন মুসলিম লীগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। কর্মসূচিটি কার বিরুদ্ধে ছিল? মুসলিম লীগের বক্তব্য হলো—ওটা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উলটো বুঝিয়ে বলল—'এই কর্মসূচি হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' বংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহও মনে করেন, ওই কর্মসূচি ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন মুসলিম লীগের মাঠের কর্মী। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের ঘটনার সাথে যুক্ত। ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তার বক্তব্য আর মণি সিংহের বক্তব্যের তফাত আকাশ-পাতাল। মণি সিংহের অনুসারীরা নিশ্চয়ই মনে করেন, ওই সংগ্রাম ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, যেমনটা মনে করে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার বয়ানের সাথে কীভাবে একজন কমিউনিস্ট নেতার বয়ান একেবারে হুবহু মিলে যায়?

১৬ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে দুই নেতার ভিন্ন বয়ান। প্রথমটা অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে, পরেরটা জীবন সংগ্রাম থেকে।

'২৯ জুলাই জিন্নাহ সাহেব অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভা বোম্বে শহরে আহ্বান করলেন। অর্থের অভাবে আমি যেতে পারলাম না। জিন্নাহ সাহেব ১৬ আগস্ট তারিখে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন-ডে' ঘোষণা করলেন। তিনি বিবৃতি মারফত ঘোষণা করেছিলেন,

---

২২. নির্মল সেন, আমার জবানবন্দি; ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা : ৫৭৫

https://nagorikpathagar.org

শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালন করতে। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি এটা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। কোনো রকম বাধাই তারা মানবেন না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন।

আমাদের আবার ডাক পড়ল এই দিনটা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য। হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে সভা করলেন। আমাদের বললেন—

"তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়; ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি।"

আমরা গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বের হয়ে পড়লাম। হিন্দু ও মুসলিম মহল্লার সমানে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করলাম। অন্য কোনো কথা নেই, "পাকিস্তান" আমাদের দাবি। এই দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন। আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রোপাগাণ্ডার কাছে তারা টিকতে পারলেন না। তারা হিন্দু সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিলেন এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে।'[২৩]

'১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে মুসলিম লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করে। সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় সে সময় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।'[২৪]

সিপিবি ১৬ আগস্ট সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যকে কি গ্রহণ করে, নাকি করে না? সিপিবি নেতা মণি সিংহ যে বয়ান দিয়েছেন, তা হিন্দু মহাসভার বয়ানের সাথে হুবহু মিলে যাওয়াটা কাকতালীয় নয়।

---

২৩. অসমাপ্ত আত্মজীবনী শেখ মুজিবুর রহমান, ইউপিএল, পৃষ্ঠা : ৬৩

২৪. জীবন সংগ্রাম; মণি সিংহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৫

https://nagorikpathagar.org

। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ডে হিন্দু স্বার্থের রাজনীতি করেছে।
তির যে বয়ান, সেই বয়ান সব সময় সিপিবির মুখে শোনা যায়।
াক, সিপিবি আসলে হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেসের বাংলাদেশি সং
কি অতিকথন হবে?

। নিজে কী ব্যাখ্যা দিতে চায়, আমরা শুনতে চাই। বাংলাদেশের ই
ন্য এটা জানা জরুরি।

ার্ক্স কি রাষ্ট্রীয় খরচে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন

নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলেন বাংলাদেশে
বামপন্থিরা। বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রথম এবং প্রধান দাবি এ
নে করেন, এটা একটা প্রগতিশীল কর্তব্য।

https://nagorikpathagar.org

অথচ জেনে আশ্চর্য হবেন, কার্ল মার্ক্স এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাকেই ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রামে বলেছিলেন, 'অলটুগেদার অবজেকশনেবল।'

কার্ল মার্ক্স এই কথাটা এমনি এমনি বলেননি। শিক্ষা মতাদর্শ শেখানোর জায়গা। এখানে শুধু স্কিল নয় ইডিওলজিও শেখানো হয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় যদি ফ্যাসিস্ট থাকে, সে চাইবে এই শিশুদের ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে শিক্ষিত করতে। তাই রাষ্ট্রের হাতে নয়; সমাজ বা কওমের হাতে এই দায়িত্ব থাকুক এটাই চাইতেন মার্ক্স।

তাহলে মূলধারার বামপন্থিরা নিজেদের মার্ক্সবাদী দাবি করেও মার্ক্স-এর এই চিন্তার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করছে কেন? তার কারণ, এরা মার্ক্স পড়েনি। এদের মধ্যে মার্ক্স পাঠের ঐতিহ্য নেই। এরা মার্ক্সবাদী নয়; এরা আসলে মডার্নিস্ট। মডার্নিজম হচ্ছে পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ। এরা মার্ক্স-এর নাম নিয়ে মার্ক্স-এর বিরুদ্ধেই কামান দাগে।

যারা মার্ক্স পাঠ করেছে আর এই বিষয়গুলো বুঝে তর্ক তোলার ক্ষমতা রাখে, বাংলাদশের মূলধারার বামপন্থিরা তাদের বাম মহলে ব্রাত্য করে রাখে। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিনিয়ে দেয়।

কী তামাশা!

https://nagorikpathagar.org

ইসলামে বিজ্ঞান

ইসলামে বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ–১

কয়েকদিন আগে আমার এক লেখায় 'ইসলামিক বিজ্ঞান' শব্দযুগল নিয়ে বেশ বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু এই শব্দযুগলের জন্মদাতা আমি নই। বেশ সরবেই এই শব্দযুগল অ্যাকাডেমিক মহলে আলোচিত। যাইহোক, প্রধান আপত্তি এসে দাঁড়িয়েছে ধর্মের নামে এভাবে বিজ্ঞানের ট্যাগিং চলে কি না? যদি ধর্ম মানে আমার কাছে একাট্টা কিছু একটার সংজ্ঞা থাকে এবং পশ্চিমা ধর্মই যদি ধর্মসমূহের একমাত্র স্ট্যান্ডার্ড হয়; ধর্ম বিষয়টির যে বহুমুখী বিচিত্র সৃজনশীল এলাকা আছে, সেটাকে অস্বীকার করলে নিশ্চয় প্রশ্নটির মেরিট আছে। ধর্ম হিসেবে ইসলামের মৌলিক আকিদাহর (প্র্যাকটিস) বিষয়টার তাৎপর্য বুঝতে না চাইলে নিশ্চয় প্রশ্নটির মেরিট আছে।

টমাস কুনের লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন যে, একেকটি ঐতিহাসিক অবস্থায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চার অগ্রগতি ঘটে একেকটি আদিকল্পকে (প্যারাডাইম) আশ্রয় করে। তারই ভিত্তিতে একেকটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা ঘরানা গড়ে ওঠে। তার আদর্শে রচিত নানা মডেল বা প্রতিকল্পকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তা ও পরীক্ষা চলে। সেইসব চিন্তার ফল বিজ্ঞানের নানা শাখায় আবার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে ওই আদিকল্পটিকেই প্রচার করে। এরপর এমন সময় আসে, যখন নতুন প্রশ্ন আর সমস্যার উত্তর বা সমাধান ওই আদিকল্প থেকে আর পাওয়া যায় না। তখনই সেই পুরোনো আদিকল্প সংকটে পড়ে এবং নতুন আদিকল্প তাকে প্রতিস্থাপিত করে। এভাবেই মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতা অগ্রসর হয়। এটা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য নয়; জ্ঞানকাণ্ডের যেকোনো শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

https://nagorikpathagar.org

গ্রিক ম্যাথমেটিক্স বা নিউটনিয়ান ফিজিক্স এমনই দুটো আদিকল্প বা প্যারাডাইম। আদিকল্প বা প্যারাডাইম হিসেবে ইসলাম কাজ করেছে, সেটা ঐতিহাসিক সত্য। সেই প্যারাডাইম আজকের সময়ে প্রাসঙ্গিক কি না, সেই আলোচনা নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু প্যারাডাইম বা আদিকল্প হিসেবে ইসলামের ভূমিকার অস্বীকার আদতে ইতিহাসের অস্বীকার এবং সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট।

ইসলামে বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ–২

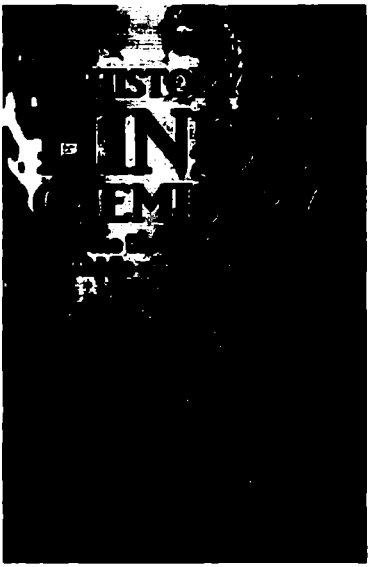

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম শুনেছেন নিশ্চয় বাংলার প্রগতিশীলরা? খুলনার সন্তান এই মনীষী তাঁর সময় সারা পৃথিবীতেই একজন নমস্য কেমিস্ট হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনিই ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একজন প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর একটা বিখ্যাত বই আছে—*A History of Hindu Chemistry.*

আমার লেখায় 'ইসলামিক সাইন্স' শব্দের ব্যবহারে যাদের গা জ্বলে যায়, দেখুন তো, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পুরো বইয়ের শিরোনাম 'হিন্দু কেমিস্ট্রি' দেখলে আপনার গা জ্বলে যায় কি না?

https://nagorikpathagar.org

এটা একটা কাঁঠাল পাতা টেস্ট। সেক্যুলার নামের মৌলবাদীদের সহজেই এই কাঁঠাল পাতা টেস্ট দিয়ে শনাক্ত করা যাবে।

ইসলামে বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ–৩

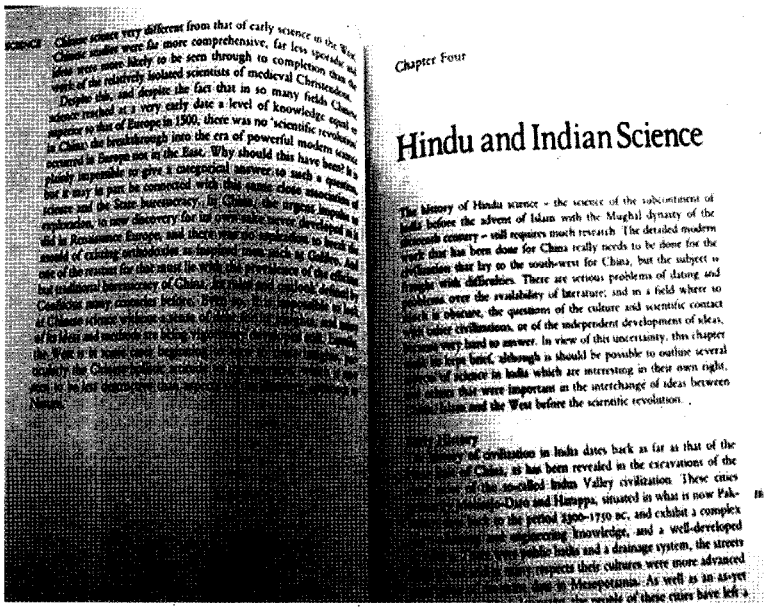

Chapter Four

Hindu and Indian Science

কিছুদিন আগে 'বিজ্ঞান নিয়ে ইসলামের প্রস্তাবনা' শিরোনামে একটা নোট লিখেছিলাম। সেখানে আমি 'ইসলামিক সায়েন্স' শব্দ দুটো ব্যবহার করেছিলাম। এতে বাংলাভাষী প্রগতিশীলরা(!) বেশ কিছুদিন আমার সমালোচনায় মুখর ছিলেন।

'ইসলামিক সায়েন্স' শব্দগুলো আমার আবিষ্কার নয়। আমি প্রমাণ সহকারেই বলার চেষ্টা করেছি যে, ইসলামিক সায়েন্স শব্দযুগল একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কয়েকদিন আগে একটা বই সংগ্রহ করেছি। *Science: Its History and Development Among the World's Cultures* লিখেছেন Colin A. Ronan; বইটা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত। বইটা পড়তে পড়তে এখানে এসে চোখ আটকে গেল 'হিন্দু সায়েন্স' শব্দ দুটো দেখে। আমি জানি না, বাংলাদেশের প্রগতিশীলরা এখন এটা দেখে ম্যাতাকার শুরু করবে কি না।

https://nagorikpathagar.org

সারা দুনিয়ার একাডেমিশিয়ানরা যেই শব্দ ব্যবহারে কুণ্ঠিত নয়, সেই শব্দ ব্যবহারে বাংলার প্রগতিশীলদের গা জ্বলে কেন?

'এইসব অর্ধশিক্ষিত প্রগতিশীলদের নিয়ে জাতি কী করবে?'

ইসলামের বিজ্ঞান ছাড়া আজকের বিজ্ঞান অকল্পনীয়

> 'Science as we know it today would have been inconceivable without Islamic science'
> 'বিজ্ঞানকে আজ আমরা যেভাবে জানি, তা ইসলামিক বিজ্ঞান ছাড়া অকল্পনীয় ছিল।'

কথাটা আমার নয়। 'ফিলোসফি অব সাইন্স'-এর একটি প্রারম্ভিক পশ্চিমা বইয়ের একটা কোটেশন। ফিলোসফি অব সাইন্স পড়তে গিয়ে ইসলামের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাবনা সম্পর্কে জানলাম। এই অসাধারণ প্রস্তাবনা সম্পর্কে আমি বিজ্ঞান পড়ে এবং একটি মুসলিমপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করে এত দিনেও জানতে পারিনি বলে হতাশ হলাম। ইসলাম ও বিজ্ঞান নিয়ে এত দিন যে সমস্ত আলোচনা শুনেছি, সেগুলো সবই অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো।

পুনশ্চ : ফিলোসফি অব সাইন্স পড়তে গেলে ইসলাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনাকে জানতেই হবে। ইসলামকে বাদ দিয়ে আপনি এগোতে পারবেন না, এমনকী আপনি পশ্চিমা হলেও পারবেন না।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

অপটিক্সের বিজ্ঞান কয়েকজন আরব বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী। এই আরব বিজ্ঞানীদের বইগুলো রচিত হয়েছিল আব্বাসীয় আমলে। বাগদাদের ইবনে সাহাল প্রিজম আর কাঁচে আলোর প্রতিসরণ নিয়ে লিখেন। ১১ শতকের আরবীয় বই *Kitāb al-manāzir ('Book on Direct Vision')*-এ তা লিপিবদ্ধ হয়। বইটি লিখিত হয় কায়রোতে। লিখেন ও সম্পাদনা করেন ইবনে আল হাইসাম। এই বইয়ে ইবনে আল হাইসাম লেন্সের বৈশিষ্ট্য, আলোর প্রকৃতি এবং চোখের এনাটমি সম্পর্কে লিখেন। এই বইটির একটি ল্যাটিন অনুবাদ

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশিত হয় প্রায় একশো বছর পরে। এই বইয়ের লেখা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ইংল্যান্ডের রজার বেকন লেন্স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এর ফলেই তেরো শতাব্দীতে ইউরোপে খুব প্রাথমিক ধরনের পড়ার চশমা আবিষ্কৃত হয়। এরপর প্রায় তিনশো বছর অপটিক্স নিয়ে গবেষণা খুব একটা এগোয়নি। ১৫৭২ সালে সুইজারল্যান্ডের বাজেলে প্রকাশিত হয়—Ibn al-Haytham's Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri septem ('The Seven Books of the Arabian Alhazen's Treasury of Optics'). ইউরোপের জন্য ইবনে আল হাইসামের অপটিক্সের বই বস্তুতই ছিল এক গুপ্তধন। এই বই প্রকাশের ১৮ বছরে মধ্যেই ইউরোপে আবিষ্কৃত হয় মাইক্রোস্কোপ, আর ৩৬ বছরের মধ্যে টেলিস্কোপ।[২৫]

বিজ্ঞান কি একটা ধর্ম

ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে আমার একটা বিতর্ক কিছুদিন আগে হয়েছিল। ব্রাত্য রাইসু বলেছিলেন, বিজ্ঞানও একটা ধর্ম। আবার কেউ কেউ বলেন, বিজ্ঞান একটি আদর্শ।

আসুন, প্রথমে বিজ্ঞানের প্রশ্নটি বুঝে নিই। বিজ্ঞান ও আদর্শবাদ বিষয়ে যে বক্তব্য, তা মূলত পল ফেয়েরাবেন্ড-এর প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছিলেন—

'Science is just another ideology.'

কার্ল পপার তাঁর বিখ্যাত প্রিন্সিপাল অব ফলসিফিকেসনে এই প্রশ্নটির দারুণ দার্শনিক ফয়সালা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো তত্ত্ব বা থিওরি যদি অপ্রমাণ বা ফলসিফাই করার জন্য মুক্ত থাকে, তবে সেটা বিজ্ঞান। যদি সেটা ফলসিফাইড হওয়ার জন্য মুক্ত না থাকে, তবে সেটা আদর্শ।

বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব ফলসিফাই হওয়ার জন্য মুক্ত, তাই বিজ্ঞান কোনো আদর্শবাদ হতে পারে না।

---

[২৫]. Lenses and Waves: Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century (Dordrecht: Kluwer, 2004).

https://nagorikpathagar.org

ভারত ও বাংলাদেশ ইস্যু

হিন্দু-মুসলমানদের লজ্জার ইতিহাস

এই ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল থেকেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর রক্তাক্ত সংঘাতের ইতিহাস। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নির্মোহভাবে বলতে হবে, উভয় সম্প্রদায়ের লজ্জার ইতিহাস আছে। এখন এই ইতিহাস নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে কি আমরা সামনে এগোতে পারব, নাকি অতীত ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে সামনের দিনগুলো তৈরি করব? কোনো সন্দেহ নেই, ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলোকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি যারা করে আর পারস্পরিক ঐক্যের বদলে বিভেদের রাস্তা যারা রচনা করে, তাদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়। আবার ভারত-বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাত আছে বলে বিশেষত একালে সম্পর্ককে দাস অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে বলে জনগণের ক্ষোভকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হিসেবে তুলে ধরতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যও মহৎ নয়। হিন্দুরা খারাপ আর মুসলমানরা ভালো বলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে?

সোজা কথা এটা দুই রাষ্ট্রস্বার্থের মধ্যে সংঘাত। ফলে এটা হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অথবা মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর ভালো বা মন্দের ইস্যুই নয়। এটা ঠিক যে, আমরা ভারতের বাংলাদেশনীতির ঘোরতর বিরোধী। সামনের দিনগুলোতে এগোতে হলে এই ভূখণ্ডের সকল মানুষকে তার ধর্ম-বর্ণ-জাত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও একটি অভিন্ন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী বা পলিটিক্যাল কমিউনিটি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সে তার সমস্যায় নিজ সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে নয়; বরং একটা একক পলিটিক্যাল কমিউনিটির সদস্য হিসেবে নিজের মতামত রাখবে।

https://nagorikpathagar.org

এখন যদি একজন হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়ে হিন্দু স্বার্থ অথবা মুসলমান স্বার্থ বলে তার সমস্যাকে উত্থাপন করে আর হিন্দু বা মুসলমান কায়দায় সেই সমস্যার সমাধান দাবি করে, তাহলে এটা বিভেদাত্মক, যেটাকে আমরা প্রচলিত অর্থে সাম্প্রদায়িক বলি। অনেকেই ভারত রাষ্ট্রের নেতা ও শাসকের নীতি ও রাজনীতির বদলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমালোচনা করছেন। আবার সেটাও উত্থাপন করে নিজ মুসলিম পরিচয় থেকে, নাগরিক পরিচয় থেকে নয়; তাই এটা বিভেদাত্মক।

ভারত রাষ্ট্রের নেতা ও শাসকের নীতি ও রাজনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের হিন্দুত্ব ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা ও শয়তানিগুলোও তুলে ধরা যেতে পারে। এমনকী তাদের ইসলামবিদ্বেষ নিয়েও কথা উঠতে পারে। কিন্তু সেটা হিন্দুরা খারাপ আর মুসলমানরা ভালো—এমন পাটাতন তৈরি করে বলা যাবে না। সাম্প্রতিক সময়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা সমালোচনা করাই যায়, সেটা মুনতাসির মামুন থেকে শুরু করে বদরুদ্দীন উমর পর্যন্ত করেছেন—বিশেষ করে বাংলাদেশের হিন্দুদের বিজেপি রাজনীতির দিকে হেলে পড়া বা প্রভাবিত হওয়া নিয়ে। যার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভেদাত্মক বা সাম্প্রদায়িক আচরণ আমরা এখন লক্ষ করছি। কিন্তু সেটার সমালোচক হতে হবে নাগরিক হিসেবে বা পলিটিক্যাল কমিউনিটির সদস্য হিসেবে। নাহলে অভিযোগ আর পালটা অভিযোগ চলবে অনন্তকাল এবং আমরা পলিটিক্যালি কোথায়ও পৌঁছতে পারব না।

ভারতের বিজেপি এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায় নিয়ে তার বিশেষ কিছু রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ এই চক্রে বুঝে হোক বা না বুঝে হোক ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহ ভারতে বিজেপির মুসলিমবিরোধী রাজনীতির পালে হাওয়া জোগাবে—এটা তাদের অনুমান। দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক সাফল্য না থাকায় এবং নানা রাজনৈতিক আছাড় খেতে থাকা মোদি সরকার পরবর্তী নির্বাচনে প্রবল মুসলিমবিরোধী স্লোগান তুলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইবে। সেই মুসলিমবিরোধিতার পাটাতন তৈরি করতে এক উপাদান হবে বাংলাদেশের হিন্দু নিগ্রহের চিত্র দিয়ে। আর এই হিন্দুবিরোধিতার সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি করছে কেউ কেউ। আর এটা যে শেষতক বিজেপিকে সাহায্য করবে, এতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে? হিন্দু বিরোধিতা আর ভারত বিরোধিতা এক করে ফেলা যাবে না। ভারত বিরোধিতা মানে ভারত রাষ্ট্রের নেতা ও শাসকের নীতি ও রাজনীতির বিরোধিতা। তাদের বাংলাদেশনীতির বিরোধিতা। এই সহজ বিষয়টাকে গুলিয়ে যারা হীন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চান, তারা দুরাত্মা, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের শত্রু।

https://nagorikpathagar.org

ভারতের পানি সন্ত্রাস

২৯ অক্টোবর ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফারাক্কা নির্মাণের পরিকল্পনায় তাদের উদ্‌বেগের কথা লিখিতভাবে ভারত সরকারকে জানায়। ৮ মার্চ ১৯৫২ সালে ভারত সরকার লিখিতভাবে উত্তর দেয়। তারা বলে—

> 'The project is only under preliminary investigation and that concern was hypothetical.'
> 'প্রকল্পটি এখন প্রাথমিক সমীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে এবং আপনাদের উদ্‌বেগ অনুমাননির্ভর।'

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। যারা সেই সময় প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়েছে এবং যারা উদ্‌বেগকে 'অনুমাননির্ভর' বলে উত্তর দিয়েছিলেন, তারা আজ বেঁচে নেই।

কিন্তু উদ্‌বেগ অনুমাননির্ভর ছিল না। সেই জ্ঞানের কথা যারা বলেছিলেন, তাদের ধরার কোনো উপায় নেই। কিন্তু ভারত তো সেই মন্তব্যের দায় উপেক্ষা করতে পারে না।

১৯৭২-এ যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়, সেটার বিবেচ্য বিষয়ে গঙ্গার পানি বণ্টন ইস্যুটা ছিল না। দুটো অসম শক্তি যখন মোকাবিলা করে, তখন সিদ্ধান্ত শক্তিমানের পক্ষেই যায়। ফারাক্কা ইস্যুটাকে প্রথম থেকেই শক্তিশালী তৃতীয়পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আমরা একটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতাম। অবাক বিষয় এই যে, ফারাক্কাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অভিযোগ প্রথম জাতিসংঘে দাখিল করা হয় ১৯৭৬-এর জানুয়ারিতে। ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়েই গেছে।

২০০২ সালে ভারত মেগা রিভার লিংকিং প্রজেক্টের কথা ঘোষণা করে। এখনই আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এই বিষয়টা তুলে ধরতে ব্যর্থ হলে আরেকটা মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা সম্ভবত এখনও ভারতের 'অনুমাননির্ভর' কথাটার ওপর ভিত্তি করে ফারাক্কা ইস্যুতে ভারতকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করতে পারি।

দুইয়ে দুইয়ে চার

বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

https://nagorikpathagar.org

হিন্দু শরণার্থীদের আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা ও নাগরিকত্ব প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আগামী ১৩ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ ক্যাম্প আয়োজনের নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

একই সময়ে শুরু হয়েছে বাংলাদেশে হিন্দু পুরোহিত, সেবায়েতদের নির্মম হত্যা। হিন্দু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তাহীন ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে কার ইচ্ছায় আর পরিকল্পনায়? এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়ে কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে? এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা মোটেই নিরাপদে নেই।

বাংলাদেশ একটা ফ্যানাটিকদের দেশ—এটা প্রমাণ করাতে বাংলাদেশের কার কার লাভ আছে? এমনকী বাংলাদেশের ধর্মবাদী দলগুলোরও কি লাভ আছে? লাভ নেই। এই কাজে ফ্যানাটিকদের কাজে লাগাচ্ছে কে?

এবার এই দুই ঘটনাকে একসঙ্গে মেলান। শরণার্থীদের স্রোত তৈরি করতে চাইছে কে?

দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে পারলেই দেখবেন, এ এক ভয়ংকর যোগ।

গর্দভ নেতা সব রাষ্ট্রের জন্যই বিপজ্জনক

প্রথম আলো জানাচ্ছে—বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি কয়েকদিন আগেই লিখেছিলাম, বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের রাষ্ট্র মনে করে ইন্ডিয়াকে। তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী তারা থাকেন না; থাকেন ইন্ডিয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে। আমার তিক্ত বচনকে তারা নিজেরাই নিজেদের বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মীর রাষ্ট্র ছিল ইংল্যান্ড আর ব্যাবসার ক্ষেত্র ছিল ইন্ডিয়ান কলোনি। বাংলাদেশের হিন্দু নেতারা ঠিক তেমন করেই বিষয়টা উপস্থাপন করলেন নাকি? এক রাষ্ট্রের নাগরিক আরেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে নিরাপত্তা চায়?

ইন্ডিয়াও বাংলাদেশের এমন গর্দভ হিন্দু নেতাদের নিয়ে পেরেশানিতে আছে আমি নিশ্চিত। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের উচিত—এই গর্দভ নেতাদের বিতাড়িত করা।

https://nagorikpathagar.org

সোহরাওয়ার্দী প্রবলভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন

বাংলাদেশের বামপন্থিরা মোটাদাগে সোহরাওয়ার্দীকে একজন খারাপ রাজনীতিবিদ হিসেবে বলে থাকে। বাম দলগুলো গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর জন্য সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করে। সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে আমার প্রথম ভুল ভাঙে *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* পড়ে; তারপর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়ে। শেষে ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের *সময়ের কণ্ঠস্বর* আমাকে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিয়েছে।

আমার এখনকার মূল্যায়নে শহিদ সোহরাওয়ার্দী এক গরিবদরদি, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা, যিনি প্রবলভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন, তখনই বাম বা বামঘেঁষাদের পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

তিনি গরিবদরদি হয়ে ফিরে এসেছিলেন ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরে। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে যারা যেত, ইংল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাথে যোগাযোগ করত এবং মার্কসবাদে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করত। দেশে ফিরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিলেও খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠন পরে কমিউনিস্টরা দখল করে নেয়। কিন্তু এটা ছিল সোহরাওয়ার্দীর শ্রমে গড়া। তবে কমিউনিস্টদের মতো লাল ঝান্ডা সংগঠন নয়; সবুজ ঝান্ডা সংগঠন। এই সংগঠনের শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের লাল ঝান্ডার বদলে সবুজ ঝান্ডা ব্যবহার করত।

তিনি মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশের সাথে মিলে 'রায়ত-খাতক' সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সভাপতি আর তর্কবাগিশ সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতিরও লক্ষ্য ছিল 'রায়ত' অর্থাৎ কৃষক প্রজাদের ওপরে জমিদারের অত্যাচার বন্ধ করা আর 'খাতক' অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার ওপরে মহাজনের অত্যাচার বন্ধ করা।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলা বলতে পারতেন না। পরে তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষা শিখেছিলেন। যদিও প্রথম দিকে তাঁর অদ্ভুত ভাষার বাংলা বক্তৃতা হাস্যরসের উদ্রেক ঘটাত। একবার তিনি কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যানের বাংলা করে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বললেন, 'ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মাগীগণ'।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক নেজামে ইসলাম পার্টির মওলানা আতাহার আলী ১২ জনের তালিকা দিয়ে বলেন, এরা বর্ণচোরা কমিউনিস্ট;

https://nagorikpathagar.org

এদের মনোনয়ন দেওয়া যাবে না। আবার এই বারোজন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলাই বাহুল্য, নেজামে ইসলাম পার্টির অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। তারা সকলেই গোপনে পার্টির সদস্য ছিলেন এবং এটা সোহরাওয়ার্দী খুব ভালোভাবেই জানতেন।

সোহরাওয়ার্দী এগিয়ে এলেন উদ্ধার করতে। তিনি বললেন—'আমি বিলাতে কমিউনিস্ট দেখেছি, আমি কমিউনিস্ট চিনি, কমিউনিজম বুঝি। এ মুসলিম ক্যান নেভার বি এ কমিউনিস্ট (একজন মুসলমান কখনো কমিউনিস্ট হতে পারে না)। অ্যাট মোস্ট দে ক্যান বি কল্ড লালমিয়া (তাঁরা বড়োজোর লালমিয়া হতে পারে, যারা মুখেই কেবল কমিউনিস্ট বুলি আওড়ায়)।'

শেষ পর্যন্ত মওলানা আতাহার আলীর তালিকা ১২ থেকে কমে একজন হলো। তিনি হাজি দানেশকে কিছুতেই নমিনেশন দেবেন না। সোহরাওয়ার্দী আর আতাহার আলী নমিনেশন বোর্ডে বসেছেন। হাজি দানেশ ঢুকবেন। আগেই সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রিয় শিষ্য শেখ মুজিবকে বলে দিয়েছেন, হাজি দানেশকে যেন ভালো করে ব্রিফ করে দেওয়া হয়।

হাজি দানেশ ঢুকলেন রুমে টুপি-দাড়ি নিয়ে। টুকেই লম্বা করে বলে উঠলেন– 'আসসালামু আলাইকুম'। সোহরাওয়ার্দী বলে উঠলেন– 'দেখেন মওলানা সাহেব, কমিউনিস্টদের মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপি থাকে? ওরা কখনো, "আসসালামু আলাইকুম" বলে? ওরা বলে "লাল সালাম"।'

মওলানা আতাহার সাহেব মাথা নাড়েন। তিনি বলেন– 'না স্যার, আপনি জানেন না, সে পাক্কা কমিউনিস্ট। আমার কাছে খবর আছে।' সোহরাওয়ার্দী বলেন– 'আরে দেখেন, তাঁর দাড়ি আছে, টুপি আছে।' মওলানা সাহেব ছাড়বেন কেন? তিনিও বলেন, 'মার্কস-লেনিনেরও টুপি-দাড়ি দুটাই ছিল স্যার, আপনি তো জানেন।'

এবার বিরস বদনে সোহরাওয়ার্দী প্রশ্ন করলেন—'হাজি সাহেব, নমিনেশন দিলে পাস করবেন তো?' হাজি সাহেব ঘর কাঁপিয়ে উত্তর দিলেন—'ইনশাআল্লাহ স্যার, পাস করব।' এইবার সোহরাওয়ার্দী লাফিয়ে উঠলেন, 'এই দেখেন মওলানা সাহেব, একজন কমিউনিস্ট কখনো আল্লাহ বলতে পারে না। কমিউনিস্ট আল্লাহ বললে সে কমিউনিস্ট থাকে না। যান হাজি সাহেব, আপনাকে নমিনেশন দেওয়া হলো।'[২৬]

---

২৬. *তথ্যসূত্র : সময়ের কণ্ঠস্বর, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, আলোঘর প্রকাশনা, আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৮*

https://nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধ

জাফর ইকবাল : উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

জাফর ইকবাল দাবি করেছেন, দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের জিয়াউর রহমান ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

> 'বাংলাদেশ অ্যাবাউট টার্ন করে পুরোপুরি উলটোদিকে পাকিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করল। নেতৃত্ব দিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জেলখানা থেকে যুদ্ধপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেল, তারা রাজনীতি করা শুরু করল।'

দণ্ডিত কাউকে ছেড়ে দিতে হলে কোনো না কোনো একটা পদ্ধতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। জাফর ইকবাল বলেননি, কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে জিয়াউর রহমান দণ্ডিত দালালদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি বলতে চেয়েছেন, জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করেছিলেন; তাই দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়। দালাল আইন বাতিল আদেশ কি জিয়া বলবৎ করেছিলেন? সেই দালাল আইন বাতিল আদেশ অনুসারে কি দণ্ডিত কারও ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল? আসুন, বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে ৩৭ হাজার ব্যক্তিকে আটক করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না, তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই সময়ের সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়েছিল—যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে মামলা দায়ের করা হবে।

https://nagorikpathagar.org

ওই ঘোষণার পরে প্রায় ৩৭ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার অভিযুক্ত বন্দি ছাড়া পান। কারাগারে ও পলাতক অবস্থায় থাকেন প্রায় ১১ হাজার। এই ১১ হাজারের মধ্য থেকে ৭৫২ জন আদালতে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দালাল আইন ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাতিল হয়। এটি বাতিল করেন রাষ্ট্রপতি সায়েম। জিয়াউর রহমান নিজে এটা বাতিল করেননি।

১৯৭৫ সালে সায়েমের করা বাতিল আইনটির মাত্র দুটো ধারা ছিল। প্রথম ধারায় বলা হচ্ছে—'পিও-৮' বাতিল করা হলো। 'পিও-৮' মানে হচ্ছে, PRESIDENT'S ORDER NO. 8 OF 1972. দালাল আইন ১৯৭২ বলতে দ্যা বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২-কে সংক্ষেপে 'পিও-৮' বলা হতো।

দ্বিতীয় ধারায় বলা হচ্ছে—'এই আইন বাতিলের আগে যাদের নামে যেকোনো আদালতে বা কর্তৃপক্ষের সামনে মামলার কার্যক্রমবিষয়ক যা-ই চলতে থাকুক না কেন, তা আর সামনে এগোবে না। যেখানে যে অবস্থায় যা আছে, তা মৃত্যুমুখে পতিত হবে।' আর যারা দণ্ডিত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বাতিল আইনের ধারাটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানেই দণ্ডিত অপরাধীরা যেন ছাড়া না পেয়ে যায়, তার জন্য রক্ষাকবচ দেওয়া ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, 'যারা দালাল আইনে ইতোমধ্যে দণ্ডিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আপিল করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বাতিল অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হবে না।'

দালাল আইনে দণ্ডিতদের ক্ষেত্রে বাতিল আইন এমনভাবে প্রযোজ্য হবে—যাতে ধরে নিতে হবে, বাতিল আইন কখনো জারিই করা হয়নি।

বাতিলকৃত আইনের সুযোগে কোনো দণ্ডিত অপরাধীর জেলখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সায়েমের দালাল আইন বাতিলের পেছনে জেনারেল জিয়ার হাত ছিল বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। যদি সেটা সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে বাতিল আইনের দ্বিতীয় ধারায় দণ্ডিত দালালরা যেন সাজা থেকে মুক্তি না পায়, তার রক্ষাকবচ দেওয়ার কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকেই দিতে হবে।

দণ্ডিত অপরাধীরা কীভাবে জেল থেকে বেরিয়ে গেছে, সেটা খোঁজ করেন আগে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিলে কি চলবে?

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে জিয়াউর রহমান

একালে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে কথা বলায় অনেকে খ্যাপা। তবুও জিয়াউর রহমান সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের উল্লেখ করা দরকার। কেন জানি না আজ পর্যন্ত বিএনপি'র নেতা-কর্মী-বুদ্ধিজীবীকে এটা নিয়ে কথা বলতে শুনিনি।

জিয়া মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তির কাছে একটা আহ্বান জানিয়েছিলেন। এটা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই আহ্বানে আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ ও পাকিস্তানিদের নৃশংসতার উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ যে মুক্তির জন্য লড়ছে, তা দুনিয়া সম্ভবত প্রথম যুদ্ধের ময়দান থেকে একজন সেনা কমান্ডারের মারফত জানতে পেরেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যুদ্ধের ময়দান থেকে এটাই ছিল প্রথম আহ্বান। তখনও সিলেটের তেলিয়াপাড়ার আমাদের সব জায়গার প্রতিরোধ কমান্ডারদের সম্মেলন হয়নি। প্রবাসী সরকার তখনও চেহারাই নেয়নি। যে কমান্ডার তিন দিন আগে বিদ্রোহ করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াইয়ের প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই আবার প্রতিরোধের ময়দান থেকে দুনিয়াকে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছেন। জিয়াউর রহমান এই সময়ে শুধু আর একজন সেক্টর কমান্ডার থাকেননি; তিনি হয়ে উঠেন বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠস্বর। আর আজকে নব্য চেতনাবাদীরা এই জিয়ার দেশপ্রেম আর সাহসিকতা নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক মহানায়ককে বামন বানানোর অপচেষ্টা করে। আফসোস!

আমি পাঠকদের জন্য মূল ইংরেজি ঘোষণা এবং তার বাংলা অনুবাদ পেশ করলাম।

পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার আহ্বান—

https://nagorikpathagar.org

'From Major Zia

Declaration:

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valiant freedom fighters of Sadhin Bangla. But they have been thrown back and many of them have killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 air crafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing civilians, men, women and children brutally. So far at least ..... thousands of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin bangle Liberation Army is pushing the Punjabis from one place to other.

At present Punjabis have utilized at least two Brigade of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation.

I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions.

Signature
Major Ziaur Rahman
31.3.71'

https://nagorikpathagar.org

'মেজর জিয়ার কাছে থেকে

ঘোষণা :

পাঞ্জাবিরা চট্টগ্রাম শহর এলাকাতে থার্ড কমান্ডো ব্যাটালিয়ন দিয়ে স্বাধীন বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আক্রমণকারীদের অনেকেই নিহত হয়েছে। পাঞ্জাবিরা ব্যাপকভাবে এফ-৮৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আক্রমণ এবং বেসামরিক জনতাকে হত্যা করছে। তারা পাশবিকভাবে বেসামরিক মানুষ, নারী, পুরুষ এবং শিশুদের হত্যা করছে। এ পর্যন্ত শুধু চট্টগ্রাম এলাকাতেই হাজার হাজার বাঙালি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী পাঞ্জাবিদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে পাঞ্জাবিরা কমপক্ষে দুই ব্রিগেড স্থল সেনা, নৌ সেনা ও বিমান সেনা ব্যবহার করছে। এটা আদতে একটা যৌথ অপারেশন।

আমি আবারও জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তির কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন সশরীরে এখানে আমাদের সাহায্য করার জন্য হস্তক্ষেপ করেন। দেরি হলে আরও লাখ লাখ মানুষ গণহত্যার শিকার হবে।

স্বাক্ষর
মেজর জিয়াউর রহমান
৩১/০৩/১৯৭১'

https://nagorikpathagar.org

আমেরিকা, পশ্চিম ও মুসলিম সম্প্রদায়

আমেরিকায় দাসব্যবস্থা এবং মুসলিম সম্প্রদায়

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে যাদের ধরে এনে আমেরিকায় দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। দাস ব্যবসায়ীরা বেছে বেছে মুসলমান নিগ্রোদের ধরে আনার ক্ষেত্রে খুব উৎসাহী ছিলেন। রিলিজিয়াস ডিক্রিমিনেশন ছিল দাস ব্যবসায়ীদের। এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, আফ্রিকান দাসদের উনমানুষ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলেও এই মুসলমান দাসরা প্রায় সকলেই লিখতে-পড়তে পারত। নারীদের সবাই লেখাপড়া জানত। এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউরোপেও নারী শিক্ষার এত প্রসার হয়নি। তাদের একটা বড়ো অংশ ছিল সুফিজমে দীক্ষিত। তারা সংগীতের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ার চর্চা করত। এমন একটা উন্নত সংস্কৃতির মানুষদের ধরে এনে সভ্যতাগর্বী পশ্চিমারা তাদের সাথে কী বর্বর আচরণটাই না করেছে। এদের ধর্ম পালন করতে না দিলেও তারা তাদের ধর্মীয় প্র্যাক্টিসকে সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে সংগোপনে। যখনই সুযোগ হয়, তখনই তারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যায় ঢাকঢোল পিটিয়ে। এ কারণেই আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতদের সংখ্যা বেশি। এটা রিলিজিয়াস কনভারশন নয়; বরং আগের নিজের ধর্মে ফিরে যাওয়া। তারা তাদের সেই সুফি সংগীতের ঐতিহ্যের সাথে আমেরিকান বর্বর আচরণের বেদনাকে মিশিয়েই জন্ম দিয়েছে নতুন ধরনের সংগীত ধারা, ব্লুজ, জ্যাজ আর রক এন রোল। গানের সুরে সুরে বেঁধে রাখা তাদের বেদনার কান্না সবাইকে স্পর্শ করবে নিশ্চয়।

https://nagorikpathagar.org

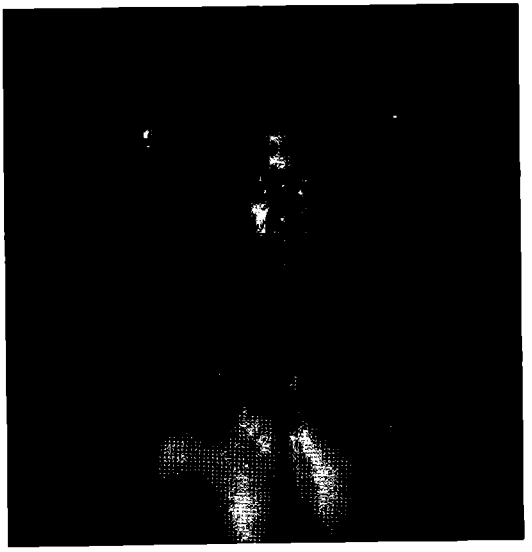

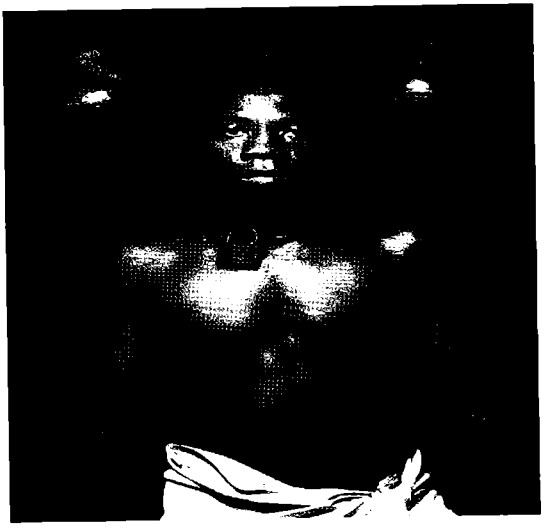

https://nagorikpathagar.org

ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায়, কীভাবে শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখা হতো পশুর মতো, যেন কেউ পালাতে না পারে।

https://nagorikpathagar.org

সন্ত্রাসী হামলা এবং মুসলমানদের গিল্ট কনসাশ

আজকের মতো একটা দিন এলে পৃথিবীর সকল মুসলমানই সম্ভবত গিল্ট কনশাসে ভোগেন। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে মুসলমানদের দিকে অনেক আঙুল ওঠে। দ্বিগুণ উৎসাহে বিপুল ঘৃণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামোফোবিকরা। নিহত হয় মানুষ। আর আহত হয় সারা পৃথিবীর মুসলিম আত্মপরিচয়। আমি মুসলমানদের এই বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি। নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা অপরাধ। কিন্তু এই সন্ত্রাসী হামলা যারা করেছে—তারা কিন্তু মনেই করছে না, এরা কোনো অপরাধ করছে; বরং মনে করছে এটি অতি পুণ্যকাজ। এই পুণ্যকাজ মনে করার পেছনে আছে ধর্মের এক বিশেষ বাণী—যেটার ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পৃথিবীতে যেকোনো আদর্শের ফ্যানাটিক বাণী তৈরি করা সম্ভব; এমনকী মার্ক্সবাদেরও।

আদর্শের ফ্যানাটিকদের ভালো কথা বলে ফেরানো সম্ভব নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। প্রকৃত মুসলমান সন্ত্রাস করে না—এমন কথায় এদের কেউ সন্ত্রাসের পথ থেকে ফেরাতে পারবে না। ফেরাতে পারবে না শক্তি প্রয়োগ করেও। পৃথিবীর বাঘা-বাঘা পরাশক্তি ব্যর্থ হয়েছে। আল-কায়দা, তালেবান, আইসিস—কেউ নিশ্চিহ্ন হয়নি। ওরা একটা ঘটনা ঘটায় আর তা পত্রে-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। রিক্রুট হয় আরও অনেকে। একটাই রাস্তা আছে। সেটা হচ্ছে, ইসলামের গভীর দর্শনের পুনরাবিষ্কার। ইসলামের পালটা সরল বাণী—যেটা একই সঙ্গে বিপ্লবী। আধুনিকতার গভীর অসুখ সারানোর দাওয়াই যে ইসলাম দিতে পারে, সেটা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়া। এই কাজটি করা সম্ভব। শুধু ইসলামকে আন্তরিকভাবে জানতে হবে। তাহলেই মুসলিম তরুণরা এই জ্ঞানকাণ্ডে আকৃষ্ট হবে। বিপুল শক্তি নিয়ে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণই এই অমানিশা থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে। এই কাজ শুধু মুসলমানদের নয়; এই কাজ করার জন্য সবাইকে মুসলমান হওয়ারও প্রয়োজন নেই। কারণ, কুরআন তো শুধু মুসলমানদের জন্য নাজিল হয়নি; সমস্ত মানবজাতির জন্যই হয়েছে।

প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলা

প্যারিস আমার প্রিয় শহর। দীর্ঘদিন ফরাসি বহুজাতিকে কাজ করার সুবাদে অসংখ্যবার প্যারিসে যাতায়াত করতে হয়েছে। সেই প্যারিস জল্লাদখানায় পরিণত হয়েছে দেখে আমি হতবাক। আমার সাবেক সহকর্মীদের খোঁজ নিয়েছি।

https://nagorikpathagar.org

আশ্বস্ত হয়েছি জেনে যে, সবাই নিরাপদে আছেন। প্যারিসে কারফিউ জারি হয়েছে। আমার প্রিয় এই নগরে শ্মশানের নীরবতা। কেউ এখনও পর্যন্ত ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। অনেকেই হয় আইসিস বা আল-কায়দার দিকে আঙুল তুলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দুঃসময় আমরা অনেকেই দেখিনি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের যে নয়া ক্রুসেড শুরু হয়েছে, পশ্চিমাদের সেই ক্রুসেডে দুইপক্ষেই অনন্ত রক্তপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এই রক্তপাত কোনো পক্ষই শক্তি প্রয়োগ করে থামাতে পারবে না।

তেলের ক্ষুধায় যখন লিবিয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ন্যাটোর নামে ফরাসি বিমান হামলা চলেছিল, লিবিয়ান মার্সেনারিদের অস্ত্র সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, সেদিনই এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটার বীজ বপন করা হয়েছিল। এখন আর ২০০ বছর আগের পৃথিবী নেই যে, সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে নিরাপদে ঘরে বসে মজা করা যাবে। পশ্চিমা বিশ্ব যদি তাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি না বদলায়, তেলের ক্ষুধার কারণে যুদ্ধ আর গণতন্ত্র রপ্তানি করার কর্মকাণ্ড বন্ধ না করে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পশ্চিমারাও ইসলামকে বুঝতে পারেনি, এ বিষয়ে তাদের মূর্খতা সীমাহীন। তাই ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার ধরন কী হবে, সেটা তারা ঠিক করতে পারেনি। এই সীমাহীন রক্তপাত হচ্ছে আধুনিকতার নামে এনলাইটেনমেন্ট আর ধর্মের অমীমাংসার ফল। এনলাইটেনমেন্ট পৃথিবীর সব ধর্মকে পালটে দিতে পারলেও ইসলামকে পারবে না। এটা পৃথিবী যেদিন বুঝবে, সেদিন হয়তো একটা বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে। কিন্তু এর মধ্যেই ঝরে যাবে অজস্র নিষ্পাপ প্রাণ। মুসলমানরা নিজেরাই যখন একসঙ্গে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তখনই এই সন্ত্রাস বন্ধ হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মুসলমানদের সেই একক ও সংঘবদ্ধ অবস্থানের শর্ত সৃষ্টি না করে এই বিরোধকে অমীমাংসার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই দুঃসময় কেউ একাকী পার করতে পারবে না।

পশ্চিম ইসলামকে বুঝতে পারেনি

সম্প্রতি আমার লেখায় 'পশ্চিম ইসলামকে বুঝতে পারেনি'—কথাটা উল্লেখ করায় অনেক মুক্তমনা লোক ভ্রু কুঁচকে ফেলেছেন। পশ্চিমারা বুঝতে পারবে না, এটা কী করে হয়! তাদের কাছে পশ্চিমই তো ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের অজানা কিছু না বোঝা থাকতে পারে সেটা বিশ্বাস (!) করতে তাদের কষ্ট হয়।

https://nagorikpathagar.org

এই লেখা বুঝতে হলে ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব বা থিওলজি আর আধুনিকতা—এই তিনটি বিষয় একটু খুলে বলা দরকার। আমি এখানে আধুনিকতা বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছি (**http://on.fb.me/1X4ZQlJ**)। মানুষের স্বভাব হচ্ছে 'ধর্ম'। অর্থাৎ মানুষ যা হয়ে উঠতে চায়, সেটাই 'ধর্ম'। মানুষের ধর্মকে যদি যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে যায়, সেটা হয়ে উঠে ধর্মতত্ত্ব বা থিওলজি। জ্ঞানের বিষয় হিসেবে ধর্মের উপস্থাপনা করলে সেটা হয় দর্শন।

আধুনিকতা দাঁড়িয়ে আছে যুক্তিবাদের ওপর। এই যুক্তিবাদের ভিত্তি তৈরি করেছে খ্রিষ্টতন্ত্রের ভেতর থেকে অ্যারিস্টটলের লজিক। এই খ্রিষ্টতন্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের সাথে আধুনিকতার বিরোধ নেই। ইসলাম গ্রিক চিন্তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মেটাফিজিক্সকে অতিক্রম করে গেছে। ইসলাম শুধু ঈশ্বরকে নিরাকার হিসেবে চিন্তা করেই সন্তুষ্ট নয়; সে বলে, 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই।' এখানে মেটাফিজিক্স নেই, লজিক নেই; আছে ঈমান ও আকিদা, বিশ্বাস ও প্রাকটিস। তাই ইসলাম থিওলজি না হয়ে হয়েছে পলিটিক্স। সেটার একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে, কিন্তু সেটা ভিন্ন আলোচনা। এই ইসলামকে পশ্চিমা আধুনিকতার চশমা পরে বুঝতে পারবে না। লজিক এবং মেটাফিজিক্স দিয়ে ইসলামকে বোঝা যাবে না।

ইসলামকে বুঝতে হবে ইসলামের জমিনে দাঁড়িয়ে। ইসলামের এই জমিনে দাঁড়িয়ে পশ্চিম কখনো ইসলামকে বুঝতে চায়নি, এখনও বুঝতে চাইছে না। তাই তথাকথিত আধুনিকতার লজিকের চশমা পরে পশ্চিম এবং তাঁদের স্থানীয় বরকন্দাজ মুক্তমনারা বিজ্ঞের মতো ইসলামকে অনাধুনিক বলে রায় দেয়। ইউরোপের একজন দার্শনিকই ইসলাম যেই জমিনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে বিচার করে, সেই জমিনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন কার্ল মার্কস। আগ্রহীরা ফয়েরবাখসংক্রান্ত থিসিসে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা নয়; বদলানোর প্রত্যয়ের সাথে নিরাকারের ব্যাখ্যায় ইসলামের সন্তুষ্ট না থাকা আর থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসের সঙ্গে ইসলামের ঈমান ও আকিদার বিষয়টি নিজেই মিলিয়ে দেখলে এই লেখার মর্মার্থ স্পষ্ট হবে।

https://nagorikpathagar.org

ধর্ম ও সভ্যতা

ধর্ম অবমাননা মানবাধিকার লঙ্ঘন

জাতিসংঘের হিউমান রাইটস কাউন্সিল ১৫ এপ্রিল ২০১০ সালে ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়া যায়, সে বিষয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১১ সালের ২১ মার্চ সর্বসম্মতভাবে সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের মতে—ধর্ম অবমাননা একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ। ধর্মীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা একটি মানবাধিকারবিরোধী কাজ। খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, ৭ নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ইসলাম এবং মুসলমানদের ভুলভাবে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং মুসলমান ও ইসলামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এর বিরুদ্ধে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে। এই রেজুলেশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে।

সো-কল্ড মুক্তমনারা যে ফ্রিস্টাইলে ধর্ম অবমাননা চালিয়ে গেছে, ধর্মীয় চরিত্রদের নিয়ে পর্নোগ্রাফি রচনা করেছে—এটা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন, এটা বাংলাদেশের কোনো মানবাধিকার সংস্থা একবারও কি মুখ ফুটে বলেছে?

https://nagorikpathagar.org

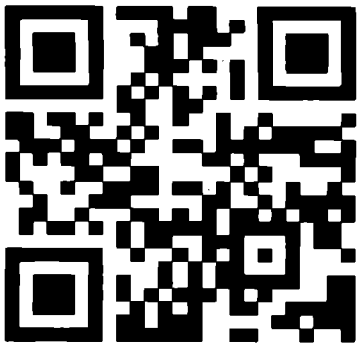

যারা মূল ডকুমেন্টটা দেখতে চান, তারা কিউআর কোড স্ক্যান করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

তরুণরা কেন ধর্মের দিকে ঝুঁকছে

নাস্তিকবাদিরা যাই প্রচার করুক না কেন, শুধু বাংলাদেশেই নয়; সারা পৃথিবীতেই বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের হার, ধর্মীয় পরিচয়মূলক পোশাক পরিধান ও ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহারের বৃদ্ধি দেখে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই ফেনমেননকে বাংলাদেশের সেক্যুলাররা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তারা যেহেতু মনে করে, ধর্ম মানেই প্রতিক্রিয়াশীলতা, তাই তাদের ব্যাখ্যাটা এমনই হয়—এই তরুণরা প্রতিক্রিয়াশিলতার দিকে ঝুঁকেছে। তারা এই ধারার সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানের বদলে নিরেট রাজনৈতিক ও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের জন্য এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা হয়েছে আরও জটিল। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান ধর্মকে ব্যবহার করেছিল, তাই তাঁরা ধর্মের উত্থানকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের উত্থান ভেবে মারাত্মক ভুল বিবৃতির জন্ম দেন। হান্টিংটনের ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন-এ এই ধর্মীয় ভাবের উত্থানের পেছনে আধুনিকতাকেই প্রধান এবং একমাত্র কারণ বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> 'The most obvious, most salient, and most powerful cause of the global religious resurgence is precisely what was supposed to cause the death of religion: the processes of social, economic, and cultural modernization that swept across the world in the second half of the twentieth century.

https://nagorikpathagar.org

Longstanding sources of identity and systems of authority are disrupted. People move from the countryside into the city, become separated from their roots, and take new jobs or no job. They interact with large numbers of strangers and are exposed to new sets of relationships. They need new sources of identity, new forms of stable community, and new sets of moral precepts to provide them with a sense of meaning and purpose. Religion, both mainstream and fundamentalist, meets these needs.

People do not live by reason alone. They cannot calculate and act rationally in pursuit of their self-interest until they define their self. Interest politics presupposes identity. In times of rapid social change established identities dissolve, the self must be redefined, and new identities created. For people facing the need to determine: Who am I? Where do I belong? Religion provides compelling answers, and religious groups provide small social communities to replace those lost through urbanization. All religions, as Hassan al-Turabi said, furnish 'people with a sense of identity and a direction in life.' In this process, people rediscover or create new historical identities.'

'বৈশ্বিক ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সবচেয়ে প্রধান, সহজ এবং শক্তিশালী কারণ নির্ভুলভাবে বলা যায়, আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ধর্মকে বাদ দিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র দুনিয়াকে ভাসিয়ে দেয়। আধুনিকায়ন দীর্ঘকালের পরিচয়ের উৎস এবং কর্তৃত্বের প্রক্রিয়া পদ্ধতিকে তছনছ করে। আধুনিকায়নের সূত্র ধরে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় করে, শিকড় ছিন্ন হয়, নতুন কাজ জোটায় বা বেকার থাকে, বিপুলসংখ্যক অপরিচিতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে এবং নতুন নতুন সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাদের জীবনের অর্থময়তা ও উদ্দেশ্যবোধ জাগাতে দরকার হয় নতুন পরিচয়ের উৎস, স্থিতিশীল কমিউনিটি, নীতি-নৈতিকতা ও অনুশাসন। একমাত্র ধর্মই মূল ও মৌলবাদী ধারা এসব চাহিদা মেটায়।

মানুষ কেবল যুক্তি দিয়ে বাঁচে না। ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে না পারে, ততক্ষণ সে ঠিকভাবে হিসাব করতে পারে না এবং নিজের স্বার্থকেন্দ্রিক কর্মও যৌক্তিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সময় দীর্ঘকালের

https://nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত পরিচয়ও হারিয়ে যায়। তখন নতুন করে নিজের পরিচয় তৈরি করে নিতে হয়। আমি কে, কোথায়, কার জন্য এলাম? মানুষকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হয়। একমাত্র ধর্মই এগুলোর উত্তর দেয়। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোই এদের জন্য একটি ছোটোখাটো সমাজ নির্মাণ করে দেয়, যারা নগরায়নের ভিড়ে এত দিন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল। হাসান আল তুরাবি বলেন, 'সব ধর্মই মানুষকে আত্মপরিচয়ের বোধ এবং জীবনের দিক-নির্দেশনার পরিচয় দেয়।' এই প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করে বা নতুন ঐতিহাসিক পরিচয়ে সৃষ্টি করে।'

পশ্চিমা সভ্যতার ভিত তৈরি করেছে খ্রিষ্টধর্ম

হান্টিংটন তাঁর *ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন* বইয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কোর হিসেবে আটটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন—

১. গ্রিক দর্শন, যুক্তিবাদ, রোমান আইন, ল্যাটিন ভাষা ও খ্রিষ্টধর্মের ক্লাসিক্যাল উত্তরাধিকার
২. ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ
৩. ইউরোপীয় ভাষা
৪. আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্তৃত্বে বিভেদ, যেটাকে আমরা সেক্যুলারিজম বলে জানি
৫. আইনের শাসন
৬. সামাজিক বহুত্ব
৭. প্রতিনিধি সংঘ
৮. ব্যক্তিবাদ।

সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথা তিনি বলেছেন দুই নম্বর পয়েন্টে। তিনি লিখেছেন—

'Western Christianity, first Catholicism and then Catholicism and Protestantism, is historically the single most important characteristic of Western civilization. During most of its first millennium, indeed, what is now known as Western civilization was called Western Christendom; there existed a well-developed sense of community among Western Christian peoples that they were distinct from Turks, Moors,

https://nagorikpathagar.org

Byzantines, and others; and it was for God as well as gold that Westerners went out to conquer the world in the sixteenth century.'

'পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টধর্ম, প্রথমে ক্যাথলিক এবং পরে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার একমাত্র ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বহন করে। এই সভ্যতা প্রথম এক হাজার বছরের বেশিরভাগ সময় খ্রিষ্টানজগৎ নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। তখন পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের মধ্যে এক উন্নত সাম্প্রদায়িকবোধ জাগ্রত হয়। তারা তুর্কি, মুর, বাইজেন্টাইন ও অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে। একই সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে তাদের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়, তারা ষোলো শতকে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়ে।'

উন্নত 'সাম্প্রদায়িক বোধ' এবং 'খ্রিষ্টধর্ম' দুটোই পশ্চিমের সভ্যতার ভিত। শুধু ধর্মের জুব্বা পরে না আসার কারণে আমরা 'ধর্ম' বা 'সাম্প্রদায়িকতা' চিনতে পারি না।

ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ

ব্যাংকক সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি লাগেজ সংগ্রহের জন্য। সামনে একটা এলইডি ডিসপ্লে। তাতে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন ভেসে আসছে। হঠাৎ একটা সরকারি বিজ্ঞাপন। গৌতম বুদ্ধের মাথার একটা ছবি আর লেখা—

'Disrespect to Buddha is wrong by law. Buddha is not a decoration piece he is the father of all Buddhists. Respect is common sense.'

মানে হচ্ছে—'বুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা আইনত দণ্ডনীয়। বুদ্ধ কোনো ডেকোরেশন পিস নয়; তিনি সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর পিতা। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন একটি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান।'

এতে থাইল্যান্ড চৌদ্দশো বছর পিছিয়ে যায়নি; বরং আধুনিক বিশ্বে ধর্ম অবমাননাকে জাতিসংঘ যে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেটারই প্রতিফলন ঘটেছে এই বিজ্ঞাপনে। এখানে খুব স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে,

https://nagorikpathagar.org

তুমি যেই দেশে ঢুকতে যাচ্ছ, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধটা কী সেটা জেনে এই দেশে ঢোকো। এটাকে সম্মান না জানাতে পারলে ফিরে যাও।

অথচ আমাদের দেশের সো-কল্ড মুক্তমনারা নবি-রাসূলকে নিয়ে পর্নগ্রাফি রচনা করে, সেটাকেই বলে মুক্তচিন্তার চর্চা। আর তাকে কেন পুলিশ দিয়ে পাহারায় রাখা হয়নি, সেটা নিয়ে তারা গগণ বিদীর্ণ করে।

বাংলাদেশের এয়ারপোর্টেও একদিন এমন লেখা থাকবে Disrespect to religion is a crime—ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ।

ধর্ম কি মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করে

বাংলাভাষী নাস্তিকদের মাথায় ঢুকে আছে যে, ধর্ম যেহেতু মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে, তাই ধর্মের উচ্ছেদ পৃথিবীর মানুষকে মিলিয়ে দেবে। সৎ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে আমি মানুষে মানুষে মেলানোর জন্য তাদের স্বপ্নকে শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু মানুষে মানুষে বিভেদ কীভাবে তৈরি হয়, সেই সমাজবিজ্ঞানের গভীরতা পাঠ না থাকায় নাস্তিকদের এই আকাঙ্ক্ষা শিশুসুলভ রোমান্টিকতা ছাড়া বেশি কিছু নয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিনিয়ত 'আদার' তৈরি করে। সেই আদার কখনো ধর্ম দিয়ে, কখনো লিঙ্গ দিয়ে, কখনো বর্ণ দিয়ে, কখনো জাতি-পরিচয় দিয়ে, কখনো শিক্ষা দিয়ে। ধর্ম ছাড়াও এমন অসংখ্য প্রপঞ্চ তৈরি করা যায়, যা দিয়ে মানুষে মানুষে ভয়াবহ বিভেদ তৈরি করা সম্ভব। ধর্ম না থাকলেও সেই বিভেদ তৈরির প্রক্রিয়া এবং 'অপর' বা আদারের নির্মাণ বন্ধ হবে না। আমার গাত্রবর্ণ যদি বিভেদের কারণ হয়, তবে কি আমি গায়ের চামড়া তুলে ফেলব?

এই প্রসঙ্গে হান্টিংটন তাঁর *ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনে* একটা চমৎকার আলোচনা করেছেন। আমি অনুবাদসহ সেটার বিশেষ অংশ পাঠকের জন্য তুলে ধরছি—

> 'Marxist-Leninism and liberal democracy can at least be debated if not resolved. Differences in material interest can be negotiated and often settled by compromise in a way cultural issues cannot. Hindus and Muslims are unlikely to resolve the issue of whether a temple or a mosque should be built at Ayodhya by building both, or neither, or a syncretic building that is both a mosque and a temple. Nor can what might seem to be a straightforward territorial question between Albanian Muslims and Orthodox Serbs concerning

https://nagorikpathagar.org

Kosovo or between Jews and Arabs concerning Jerusalem be easily settled, since each place has deep historical, cultural, and emotional meaning to both peoples. Similarly, neither French authorities nor Muslim parents are likely to accept a compromise which would allow schoolgirls to wear Muslim dress every other day during the school year. Cultural questions like these involve a yes or no, zero-sum choice.

..... For self definition and motivation people need enemies: competitors in business, rivals in achievement, opponents in politics. They naturally distrust and see as threats those who are different and have the capability to harm them. The resolution of one conflict and the disappearance of one enemy generate personal, social, and political forces that give rise to new ones. "The 'us' versus 'them' tendency is," as Ali Mazrui said, "in the political arena, almost universal.'

'দুই ইহবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও উদার গণতন্ত্রের বিরোধ কোনোদিনই মীমাংসা হবে না। বস্তুগত স্বার্থ নিয়ে সংঘাত কোনো না কোনোভাবে আপসরফা করা গেলেও সাংস্কৃতিক ইস্যু নিয়ে করা যায় না। অযোধ্যায় যদি মসজিদ-মন্দির দুটোই নির্মাণ করে দেওয়া হয়, তবুও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত নিরসন হবে না। আলবেনিয়ার মুসলমান ও অর্থোডক্স সার্বদের কসোভো নিয়েও না এবং জেরুজালেম নিয়ে আরব-ইহুদিরাও না। কারণ, অযোধ্যা বা কসোভো বা জেরুজালেমের গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আবেগি গুরুত্ব রয়েছে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোর কাছে। একইভাবে ফ্রান্সে স্কুলপড়ুয়া মুসলিম মেয়েদের হিজাব বা স্কার্ফ পরিধান নিয়ে বিরোধের মীমাংসাও কোনোদিন হবে না। সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোই এ রকম। এর মধ্যে হ্যাঁ-না বা পছন্দ-অপছন্দের মাত্রা শূন্য; এ বিষয়ে কেউ-ই আপস করে না।

.....আত্মপরিচয় এবং প্রেষণার জন্য মানুষের দরকার হয় প্রতিপক্ষ, ব্যাবসার জন্য দরকার প্রতিযোগী, কোনো কিছু অর্জনের জন্য দরকার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রাজনীতিতে দরকার বিপক্ষ। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সক্ষম প্রতিপক্ষকে সন্দেহ করে এবং নিজের জন্য হুমকি মনে করে। এক দ্বন্দ্ব দূর হলে আরেক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ রকম ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই সমান। "আমরা" বনাম "তারা" প্রবণতা যেমন আলী মাজরুই বলেন, সেভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বজনীন সমস্যা।'

https://nagorikpathagar.org

কীভাবে ধর্মের মূল্যায়ন করব

কেউ কেউ বলতে চাইছেন, ক্রিস্টমাসে তো সকল ধর্মের মানুষ উৎসবে সামিল হয়। সেখানে তো কোনো সমস্যা হয় না।

আচ্ছা ভাই! ক্রিস্টমাস তো যিশুর জন্মের স্মরণ। তো যিশুর জন্ম কি তুষার আচ্ছাদিত ক্রিস্টমাস ট্রির নিচে হয়েছিল? নাকি মধ্যপ্রাচ্যের ঊষর মরুভূমিতে হয়েছিল? তাহলে ক্রিস্টমাস যিশুর সেমেটিক অতীতকে স্মরণ করতে চায় না কেন? এই বিবর্তিত স্মরণের মধ্যে ধর্ম কতটুকু আর রাজনীতি কতটুকু সেটা বিবেচনা করুন। পরিবর্তিত এই ক্রিস্টমাসের উৎসব এনলাইটেনমেন্টের তৈরি। এনলাইটেনমেন্ট ধর্মকে বদলায়। বদলে দেওয়া ধর্মের সাথে না বদলানো অন্য ধর্মকে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া কি সংগত? সকল ধর্মের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সেগুলো আলাদা আলাদা ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মকে তার নিজের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে। এক ধর্মের গজ-ফিতা দিয়ে আরেক ধর্মের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মূর্খামি।

ধর্মহীনতার চর্চা কখনো সুফল বয়ে আনবে না

লর্ড মেকলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়, জিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন সিভিলাইজিং মিশন নিয়ে। মানে ব্রিটিশ ভারতের নেটিভ ভারতবাসীকে সভ্য করতে। ব্রিটিশ আদলে ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কারের প্রতিভূ হিসেবে আমরা তার নাম জানি। তবে তিনি ক্রিমিনাল কোডও সংস্কার করেছিলেন।

মেকলে ছিলেন আত্মম্ভরি। পেটে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম থাকলেও ভাবেই ছিলেন আম্বিয়া। মেকলের একটা বক্তব্য আজকে পড়লাম। তিনি বলেছিলেন—

> 'It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytize: without the smallest interference in their religious liberty; merely by the natural operation of knowledge and reflection.'

https://nagorikpathagar.org

> 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়, তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি সমাজে কোনো মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং আমাদের তরফ থেকে কোনো রকম ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এই ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও দরকার হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালয় জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য সাধন করা যাবে।'

এই মেকলে কেন এত গুরুত্ব পেয়েছিল এটা একটা বিস্ময়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রাথমিক সূত্রগুলোও তার জানা ছিল না। কী ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক রূপান্তর হয় সেই জ্ঞান তার ছিল না। ত্রিশ বছর তো দূরের কথা; ব্রিটিশ শাসন করেছে দুইশো বছর। তারপরেও মোটামুটি একশো বছর পার হয়েছে। এই তিনশো বছরে মেকলের সেই প্রত্যাশিত পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে কি?

পানিতে ঢিল ছুড়লে পানির উপরিভাগে মৃদু তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তার অভিঘাত পানির গভীরে পৌঁছায় না। নাস্তিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চাও ঠিক এমন। সমাজের উপরিতলে মৃদু তরঙ্গ তৈরি করে, তার অভিঘাত গভীরে যায় না। তবে সমাজ আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে খেয়াল করলে দেখবেন, ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে।

মেকলের আত্মম্ভরিতা আর নির্বুদ্ধিতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়, লন্ডনের বাতাসেও মনে হয় দোষ আছে। নইলে এই বাতাসে শ্বাস নিয়ে এখনও কেন মেকলের মতো কোনো কোনো গর্দভও নিজেকে পক্ষিরাজ ভাবে?

https://nagorikpathagar.org

বাংলা ও মুসলমান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা

বরেণ্য ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রী সুকুমার সেনের একটা বই আছে, নাম—'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। বইটা প্রকাশ হওয়ার পর তার নামে বিশাল সমালোচনা শুরু হয়। সমালোচনার মূল বক্তব্য ছিল—সাহিত্য কীভাবে 'ইসলামি' হয়? সুকুমার সেন বলেছিলেন—

> 'যাদের রচনা আমার বইটিতে আলোচিত হয়েছে, তাদেরই কেউ কেউ "এছলামি বাংগালা" নামটি ব্যবহার করেছিলেন। আমি "এছলামি" শব্দটিকে স্বাভাবিকভাবেই "ইসলামি" করে নিয়েছি। তাতে এমন কী দোষ হয়েছিল তা এখনও বুঝতে পারছি না।'

আসলে দোষ হয়েছিল অন্য জায়গায়। তিনি দেখিয়েছিলেন, বাংলা রোমান্টিক কাহিনি-কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম কবিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

১৮৩৯ সালে বাংলা শাসনকাজে ফারসির পরিবর্তে বাংলা চালু হয়। তখন বাংলা ভাষার একটা সংস্কার হয় সংস্কৃত শিক্ষিত বাঙালিদের হাতে। তারা পরিকল্পিতভাবে আরবি ও ফারসি শব্দের আমদানি বন্ধ করে। শুধু তাই নয়; স্বল্পপরিচিত আরবি ও ফারসি ভাষা বাংলা থেকে বিতাড়িত করে। বাংলায় ফারসির ব্যবহার এত সহজাত ছিল যে, হিন্দু ধর্মের রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথার ওপর ভিত্তি করে রচিত বাংলা ভাষায় চর্যাপদের পর আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শনকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ফারসি শব্দ আছে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলার সংস্কৃতায়নের সংস্কারই বাংলা ভাষার মূলধারা হয়ে উঠায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ থেকেই মূলধারা থেকে গৌণধারায় পরিণত হয়।

ভাষার রাজনীতি শুধু আবেগ দিয়ে মোকাবিলা করলেই হয় না; সাথে প্রজ্ঞা, কৌশল আর দূরদৃষ্টিও লাগে।

বাংলায় ইসলাম প্রসারের কারণ

'বঙ্গীয় মুসলিম কাঁহারা, বাংলার ধর্মান্তর এবং ইসলামিকরণ সম্পর্কে কিছু কথা' শিরোনামে রিচার্ড এম ইন-এর প্রবন্ধ কেন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল? কারণ, তিনি বাংলার এই অঞ্চলের সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে নির্মোহ দৃষ্টিতে ইতিহাস বিচার করেছিলেন।

সম্প্রতি রিচার্ড এম ইটনের প্রবন্ধের সূত্র ধরে লেখায় যে প্রশ্নগুলো এসেছিল, সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১. বাংলার পূর্বাঞ্চলে ১৭ শতকের আগে জনসংখ্যা পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ছিল। অধিকাংশ এলাকায় ছিল দুর্গম গহিন শালের জঙ্গল।

২. ১২০৪ সালে তুর্কি বিজয়ের আগে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় আর্য সভ্যতার শিকড় ছিল গভীর, বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল, বর্ধমানবাসী কবি মুকুন্দরাম বর্ণভেদক্লিষ্ট সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই বর্ণভেদ প্রথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গ ছিল হিন্দু সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীর উপত্যকায় কিছু বসতি থাকলেও বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী ছিল অনগ্রসর এবং তাদের হিন্দু ধর্ম বা সংস্কৃতি খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। রিচার্ড ইটন সাক্ষ্য দিচ্ছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা পূর্ণ হিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি।

৩. পূর্ব বাংলায় নতুন ফসলি জমি তৈরি হওয়ায় সম্রাট আকবরের সময় থেকে জঙ্গল কেটে আবাদি জমি তৈরি করার কাজে অসংখ্য পরিশ্রমী মানুষ নিয়োজিত হয়। সেই মানুষের জমিতে কোনো কর ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

এই নিষ্কর জমিতে তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে একটি মন্দির অথবা মসজিদ স্থাপন বাধ্যতামূলক ছিল। এই জমিগুলোই দেবোত্তর সম্পত্তি বলে আমরা জানি। মোঘল আমলের নথি অনুসারে জঙ্গল কাটা মানুষের স্থাপিত মন্দিরের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি ছিল। কারণ, মূলত মুসলমানরাই এই জঙ্গল কাটার নেতৃত্ব দিত।

৪. জঙ্গল কাটার নেতারা অধিকাংশ এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে এবং তাদের অনুসারীরা সেই নেতার ওপর তাদের মৃত্যুর পরে দেবত্ব আরোপ করে। তাদেরকে পীর হিসেবে মেনে নেয়। গড়ে উঠে দেবোত্তর সম্পত্তির পাশে সেই নেতার মাজার। কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে, ইসলামে মাজার নিষিদ্ধ হলেও বাংলার মুসলিম নেতারা মাজারেই এখনও নন্দিত হন। লোকায়ত ধর্মের সাথে ইসলামের একধরনের ফিউশন হয়।

৫. সেই সময়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই জঙ্গল কাটার উপাখ্যান আছে—

'পশ্চিম থেকে এলো জাফর মিয়া
তার সঙ্গে বাইশ হাজার লোক
তাদের হাতে সুলেমানের দেওয়া পুঁথি
তারা গাইছিল পিরের নাম এবং ঈশ্বরের নাম
জঙ্গল পরিষ্কার করে শয়ে শয়ে বিদেশি
এলো এবং প্রবেশ করল জঙ্গলে
কুঠারের শব্দ শুনে
ভয় পেল বাঘ এবং ছুটে পালাল ব্যাঘ্র নিনাদে।'

৬. পূর্ব বাংলায় তলোয়ার দিয়ে ইসলাম কায়েম হয়নি। ইসলাম কায়েমের নেতা ছিল পরিশ্রমী কিছু মানুষ, যারা পূর্ববঙ্গে লোকায়ত ইসলাম এবং কৃষির প্রবর্তন একইসঙ্গে করেছেন। কিছু জোর-জবরদস্তি নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু সেটাই পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রসারের নির্ধারক কারণ নয়। এই সত্যটা রিচার্ড ইটন প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই সত্য গ্রহণ করলে হিন্দুদের পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগার প্রয়োজন হবে না। মুসলমানদের আত্মগর্বী হয়ে অপর সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করতে হবে না। এই উপলব্ধি বাংলাদেশে খুব দরকার। বাঙালি জাতির দুই ধর্ম সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার জন্য ইতিহাসের ধূলি-বালি সরিয়ে সত্যের উন্মোচন জরুরি।

https://nagorikpathagar.org

বঙ্গের ইসলাম বিজয় কেন ভায়োলেন্ট হয়নি

ইসলাম বিজয়ের যুগে সেমেটিক ইসলামকে কনফ্রন্ট করেছে স্থানীয় সংস্কৃতিগুলো। বেঙ্গলও করেছে; কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হলো, বেঙ্গলে এই কনফ্রন্টেশনটা ভায়োলেন্ট হয়নি; বরং হয়েছে সমাজ সংস্কার আর প্রথম মানবতাবাদী ধারার উদ্ভব। কনফ্রন্টেশনটা হয়েছে প্রেম ও ভক্তিবাদে। কেউ কেউ এটাকে বলেন, বেঙ্গলের প্রথম রেনেসাঁস। ইসলামের আগমনে জন্ম নেওয়া একদিকে শ্রীচৈতন্যের হিন্দু ভক্তিবাদ, অন্যদিকে মুসলিম মরমি সুফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বাংলার গোটা সমাজজীবনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। হিন্দু ধর্মের মানবিক সংস্কার হয়েছিল। গোড়াপত্তন হয়েছিল এক নতুন সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির। বাংলা সাহিত্যের জন্য এসেছিল সে সময় স্বর্ণযুগ। বস্তুত এই সময়কাল থেকেই বাঙালির জীবনে এই উদার সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের হিন্দু-মুসলমান কবিদের রচনায়। 'শুনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' পনেরো শতকের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের এই অমর বাণীতে পৃথিবী প্রথম শোনে মানবতাবাদের জয়গান। ঠিক একইভাবে সতেরো শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নুরনামা'য় এক উদার সমন্বয়ধর্মী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আব্দুল হাকিম নুরনামায় লিখেছিলেন—

> 'য়াল্লা (আল্লাহ) খোদা-গোঁসাই সকল তান (তাঁর) নাম সর্বগুণে
> নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম।'

এই ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া জরুরি। বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব আর সমাজে সেই ধর্মের অভিঘাতের সেই ইতিহাস ভুলে আমরা কেউ কেউ অন্যের তৈরি করা বয়ানে বাংলার ইসলামকে মূল্যায়ন করছি। বিনির্মিত সেই ভুল ইতিহাস আমাদের নয়।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি কি সংস্কৃত ভাষা থেকে

বাংলা ভাষা কোনোভাবেই সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। সংস্কৃত একটি ভিন্ন ভাষা। তবে বাংলা এবং সংস্কৃত একই ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে সংস্কৃতসহ এই ধরনের ভাষাগুলোকে বাংলার নিকটাত্মীয় বলা যায়।

https://nagorikpathagar.org

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'ভাষার জন্ম মানুষের মতো নয় যে, নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ ধরে তার জন্মের ইতিহাস বলা যাবে।' ভাষা বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। প্রবাহিত হতে হতে কালে কালে ভাষার চরিত্র যখন আগের ভাষা থেকে বদলে যায়, তখন তাকে নতুন নামকরণ করা হয়। সেই হিসেবে আজ আমরা যাকে বাংলা ভাষা বলে জানি, তার ঠিক আগের রূপ কী ছিল সেটা নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারি। আবার তার আগের রূপ কী ছিল সেটাও জানতে পারি, এভাবে আমরা ভাষার উৎসমুখে পৌঁছতে পারি।

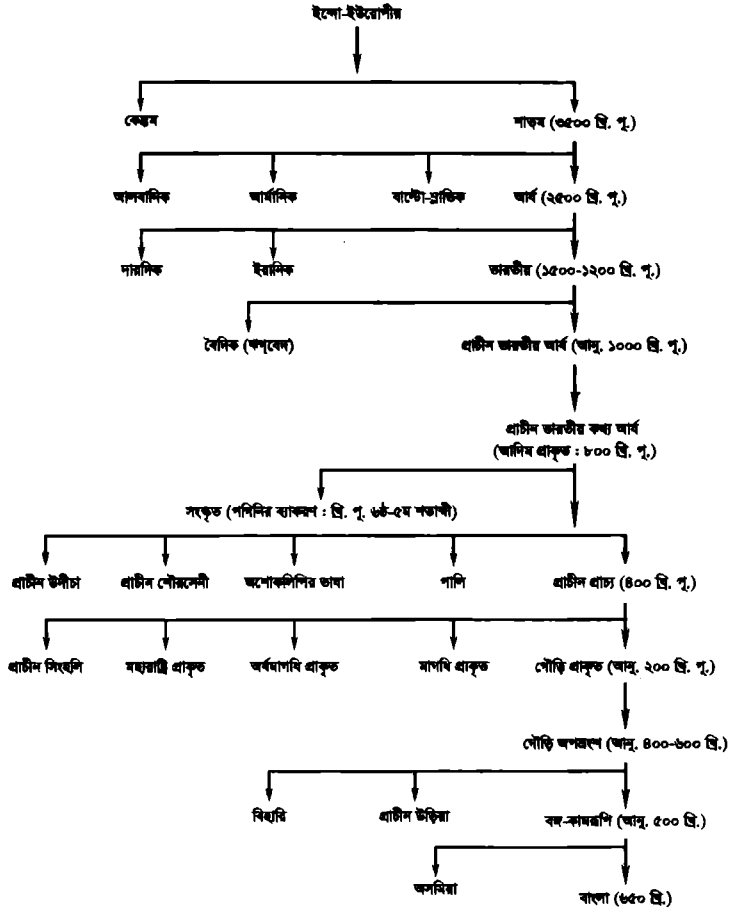

https://nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষার আগে যেই ভাষা ছিল, তা ছিল গৌড়ীয় অপভ্রংশ। খ্রিষ্টীয় ৫০০ শতকের আগে এই ভাষার পর্ব শুরু হয়। গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে মৈথেলি, উড়িষ্যা আর বঙ্গ কামরূপ ভাষার উদ্ভব হয়। বঙ্গ কামরূপ ভাষা থেকে বাংলা আর অসমিয়া ভাষার উদ্ভব।

গৌড়ীয় অপভ্রংশের আগে ছিল গৌড়ীয় প্রাকৃত। এই ভাষার উদ্ভব খ্রিষ্টাব্দ ২০০-তে। গৌড়ীয় প্রাকৃতের আগে ছিল প্রাচ্য প্রাকৃত, যার উদ্ভব খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০-তে। এই ভাষাতেই গৌতমবুদ্ধ কথা বলতেন। প্রাচ্য প্রাকৃত থেকে সিংহলি ভাষার উৎপত্তি।

এই সময়েই বাংলার অধিবাসী 'কোল' সম্প্রদায়ের সাথে পশ্চিম থেকে আগত আর্যদের মিশ্রণ হয়। কোল সংস্কৃত থেকে আমরা গায়ে হলুদ পেয়েছি। কোল সংস্কৃতিতেই বিবাহিত নারীদের সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার চল ছিল। কোলেরা ছিল মৎস্যভোজী। আমাদের মাছ খাওয়ার অভ্যাস কোলদের কাছ থেকেই পাওয়া।

চাউল, লড়াই, ঢাল, ডোঙা, বড়শি, বোকা, কানা, মোঁ—এসব কোল শব্দ। আমরা যে অনুশব্দ ব্যবহার করি বাংলায়, যেমন : ঢাকঢোল, গোলমাল, ধুমধাম, ছুরিটুরি, বোকাসোকা—এসব কোল ভাষারীতি থেকে পাওয়া।

প্রাচীন প্রাকৃতের আগে ছিল প্রাচীন আর্য কথ্যভাষা। এই প্রাচীন আর্য কথ্যভাষা থেকেই প্রাচীন প্রাকৃত আর সংস্কৃতের উৎপত্তি। সংস্কৃত ছিল অভিজাতদের ভাষা। বিশেষ প্রয়োজনে সেই ভাষা ব্যবহার করা হতো।

রামায়ণে যখন হনুমান বন্দি সীতাকে দেখেছে, তখন সে তাঁর সাথে কোন ভাষায় কথা বলবে, এটা চিন্তা করতে করতে বলছে—'আমি যদি দ্বি-জাতির মতো সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহলে আমাকে রাবণ মনে করে সীতা ভীত হবেন। সুতরাং অর্থবোধক মনুষ্যবাক্য বলা আবশ্যক, নয়তো আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বস্ত করতে পারব না।'

এই 'মনুষ্য বাক্য'ই প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা।

আজকের বাংলা ভাষার প্রচলিত বাক্য নিয়ে আগের ভাষায় কীভাবে সেটা বলা হতো, সেটা দেখলে আমরা দেখব—আজকের কথ্যভাষার সাথে আগের ভাষার কেমন মিল আছে। যেই মিল সংস্কৃতের সাথে বাংলার একেবারেই নেই।

https://nagorikpathagar.org

যেমন : আজকের বাংলায় আমরা বলি 'তুমি আছ', এটা প্রাচীন বাংলায় 'তুমহে আছহ', মধ্যপ্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'তুমহে আচ্ছহ', প্রাচীন প্রাকৃতে 'তুমহে অচ্ছথ'। ফলে আগের ভাষার সাথে যোগসূত্র বের করা যাচ্ছে।

আর সংস্কৃতে 'তুমি আছ' এই বাক্যটা কীভাবে বলা হয়? বলা হয় 'যুয়ুং স্থ'। কোনো মিল আছে? কোনো যোগসূত্র আছে? নেই। তারপরও মাথা দিয়ে কেউ পাহাড় ঠেলে বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলে কী আর করা যাবে!

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা বাংলাকে সংস্কৃতজাত বলে মত দিয়েছিলেন। এই মত দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সংযুক্ত টেবিল থেকে আপনারা এই আলাপটাকে সংক্ষিপ্তরূপে দেখতে পাবেন। আর এতে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারবেন, বাংলা আর সংস্কৃত একই ভাষার দুই সন্তান। কিন্তু কোনোভাবেই বাংলা সংস্কৃতের সন্তান নয়।

বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান

বাংলার মুসলিম বিজয় বাংলা ভাষাকে উচ্চতর সাহিত্যের আসনে উন্নীত করতে মূল ভূমিকা রেখেছে। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর *History of Bengali Language and Literature*-এ লিখেছেন—

> 'This elevation of Bengali to a literary status was brought about by several influences, of which the Mahammadan conquest was undoubtedly one of the foremost. If the Hindu Kings had continued to enjoy independence, Bengali would scarcely have got an opportunity to find its way to the courts of Kings.'
>
> 'যে কয়েকটি প্রভাবের কারণে বাংলা ভাষা উচ্চতর সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলিম বিজয়। যদি হিন্দু রাজারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজত্ব চালাতে পারত, তবে বাংলা রাজদরবারে মোটেই প্রবেশের সুযোগ পেত না।'

https://nagorikpathagar.org

দীনেশ চন্দ্র সেন আরও বলছেন—

> 'মুসলমানরা এইভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নুতন যুগ আনয়ন করিলেন। মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর মতো দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিল।' (দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের আবদান)

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

> 'Bengali literature was born in Mahommaden Age.' অর্থাৎ, 'বাংলা সাহিত্যের জন্ম মুসলিম যুগে।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও উল্লেখ করছেন—

> 'আমাদের বাংলা বিভক্তি "রা" ও "দের" মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। তা ছাড়া, আমরা কী করে ভুলে যাই, চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান সুলতান এবং রাজপুরুষদের কথা, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়?'

ভিনদেশি শাসকেরা বাংলাকে ভালোবেসে বুকে তুলে নেওয়াতে বাংলার মর্যাদা বাড়ল। স্থানীয় শাসকরা এবং বাংলার হিন্দু রাজারাও রাজদরবারে বাংলা ব্যবহার শুরু করলেন।

আজকে যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, তার উদ্ভব বা সৃষ্টিই হয়েছিল মুসলমানদের অবদানে। আসুন, বাংলা ভাষার উৎস নিয়ে কিছু আলাপ করি।

সবচেয়ে প্রাচীনতম যে বাংলা ভাষার নিদর্শন, তা চর্যাপদ। চর্যাপদ ছিল শৌরসেনী প্রভাবিত অতি আদিম বাংলা, যখন বাংলা ভাষার গঠন সুস্থির ছিল না। এখনও চর্যাপদের ভাষা বাংলা কি না তা নিয়ে একাডেমিশিয়ানরা তর্ক করেন। এ বিষয়ে স্বয়ং সুনীতিকুমার বলেছেন—'চর্যাপদের ভাষা বাংলাই, তবু সংশয় কোনো কোনো মহলে থেকেই গেল।' চর্যার শেষ পদাবলিগুলো রচিত হয়েছিল ১২০০ সাল পর্যন্ত।

সুস্থিত আদি বাংলায় প্রথম রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, যা রচিত হয়েছিল চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতকে, মুসলমান শাসন তখন মধ্যগগনে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষা মুসলমানের সৃষ্টি এটা আমার কথা নয়; দীনেশচন্দ্র সেনের কথা। তিনি কী লিখেছিলেন সেটা দেখুন—

> 'মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুঠিরে বাস করিতেছিল। বাঙ্গালা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ করে শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করতে ছিলেন এবং 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা 'পত্রাধার তৈল' এই লইয়া ঘোর বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল তেমনি ঘৃণা, অনাদার ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা-কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গালা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।'

হিন্দি একটি নির্মিত ভাষা

আধুনিক হিন্দি ভাষার বয়স ১৫০ বছরের কাছাকাছি। এই ভাষাকে স্থানীয় অনেক ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভারতে ন্যাশন স্টেট বানানোর জন্য যে তিনটি মূল স্তম্ভকে বেছে নেওয়া হয়, তার একটি হিন্দু ধর্ম, একটি হিন্দি ভাষা আরেকটি হিন্দুস্তান বলে একটি কাল্পনিক ভূখণ্ড। এই ভাষার উদ্ভব এবং বিকাশের সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু মহাসভার নাম।

দিল্লি এবং এর পাশের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে ভাষা ছিল, তাকে হিন্দি বলয়ের বাইরের মানুষরা বলত হিন্দবি বা হিন্ধি। আর নিজেরা এই ভাষাকে বলত খড়ি বোলি বা চালু ভাষা। দিল্লি ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে ব্রজভাষা, ডিঙ্গল, মেওয়ারি, আবধী, মাগহি, ভোজপুরি, মৈথিলি ইত্যাদি ভাষাগুলো ব্যবহৃত হতো। সবগুলোই খুব সমৃদ্ধ ভাষা ছিল। কবিরের বচন ছিল ব্রজভাষায় রচিত, মিরার ভজন ডিঙ্গলে, আবধির কবি ছিলেন বিখ্যাত তুলশী দাস,

https://nagorikpathagar.org

মৈথেলি ভাষায় বিদ্যাপতি আর গোবিন্দ। কিন্তু আপনি আজকে কোনো ভাষাই আর খুঁজে পাবেন না। হিন্দি সব ভাষাকে সিস্টেমিকভাবে মুছে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে তাদের অমূল্য সাহিত্যের কথাও।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, হিন্দির আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব হয় কলকাতাতেই। আর আজকে এই কলকাতাতেই হিন্দির দাপটে বাংলার ত্রাহি ত্রাহি দশা। হিন্দি ভাষার প্রসার এবং তাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয় হিন্দু মহাসভার মাধ্যমে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজ কর্মচারীরা এখানকার চাপরাশি, সহিস, জমাদার—এই ধরনের ভৃত্যস্থানীয় কর্মচারীদের সাথে এবং দোকানদার, ফেরিওয়ালা এদের সাথে কথা বলার জন্য যে ভাষার চর্চা করত, তা ছিল এই দিল্লির খড়ি বোলি, ইংরেজরা তাকে হিন্দি বলত। এই কথ্য ভাষাকে সংস্কার করে লিখিত ভাষার রূপ দেন জেমস গিলগ্রিস্ট নামের এক ইংরেজ। কলকাতা শহরেই প্রথম হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'উদন্ত মার্তণ্ড' নামে। তখনও পর্যন্ত হিন্দির জন্য বিশেষ কোনো লিপি স্বীকৃত বা গৃহীত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন যখন তার নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারত ঘুরছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন, সারা দেশের মানুষ নানা বিচিত্র ভাষায় কথা বলে, এক অঞ্চলের ভাষা আরেক অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারেন না। তিনি আশ্রয় করেন হিন্দি ভাষার এবং *সুলভ সমাচার* পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দিতে তার মতবাদ সারা ভারতে প্রচার করতে শুরু করেন। এরপরে কলকাতায় আসেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একটা বক্তৃতা দিতে। তিনি ছিলেন গুজরাটি, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের মাঝে বক্তৃতা দিতে হলে বক্তৃতা দিতেন সংস্কৃতে। এসে দেখলেন, এখানে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই হিন্দিকে সামাজিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এটা দেখে দয়ানন্দ সরস্বতী কোলকাতায় নিজের বক্তৃতাটা দেন হিন্দিতে। এরপরেই তিনি প্রস্তাব করেন, নাগরি লিপিতে হিন্দি লেখা যেতে পারে। নাগরি লিপি হচ্ছে সেই লিপি—যা দিয়ে গুজরাটি ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত চর্চা করতেন।

১৮৯০ সালে মদনমোহন মালব্য বারানসিতে নাগরী প্রচারণা সভা স্থাপিত করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দির জন্য নাগরী লিপির স্বীকৃতি আদায় আর অফিস-আদালতে আরবি-ফারসির পরিবর্তে হিন্দি ব্যবহারের জন্য আন্দোলন সংগঠন করা। ১৯২৩ সালে বারানসিতে হিন্দু মহাসভার একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়,

https://nagorikpathagar.org

সেখানে নাগরী প্রচারণা সভা ছিল কো-স্পন্সর বা সহ-আয়োজক। এভাবেই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে হিন্দির গাঁটছড়া বাঁধা হয়। আর নাগরী লিপিতে দেবত্ব আরোপের জন্য নাগরীর আগে 'দেব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে 'দেব-নাগরী' বানানো হয়। এই সভাতেই আরএসএসের ভাবজনক ড. মুঞ্জের হিন্দু স্বরাজের তিনটি মূলসূত্রের তত্ব গৃহীত হয়। এই তিনটি মূলসূত্র হচ্ছে—হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দি ভাষা। হিন্দু মহাসভা এরপর শুরু করে হিন্দি ভাষা শুদ্ধিকরণ অভিযান। এই শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে হিন্দি থেকে আরবি আর ফারসি ভাষার শব্দকে সরিয়ে শব্দ ব্যাকরণ ও ধ্বনি সবদিক থেকেই হিন্দিকে সংস্কৃতের অনুরূপ করানো হয়। তখন থেকেই উর্দুভাষীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ সৃষ্টি হলো। আগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উর্দু ভাষায় কথা বলতেন। লালা লজপত রায় ছিলেন এই হিন্দি প্রসারের একজন কর্মী, তিনি তার অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস-এ লিখেছেন, এই হিন্দি প্রসারের কাজ করাতে তার উর্দুভাষী বাবা তার ওপরে খুব ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এমনকী যে সমস্ত হিন্দুরা সেইসময় দ্বিধান্বিতভাবে হিন্দি চর্চা শুরু করেছিলেন, তারা নাগরী লিপির বদলে আরবি বা ফারসি লিপিতেই হিন্দি লিখতেন।

প্রতিভাবান হিন্দু ধর্মাবলম্বী উর্দু সাহিত্যিকরাও সামাজিক চাপে এই সময় থেকে উর্দু ছেড়ে হিন্দিতে লিখতে শুরু করেন। প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাদ একজন উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে হিন্দিতে লিখতে শুরু করার পরে তিনি যা যা লিখেছেন, তা তার উর্দু কর্মকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। ভাষার রাজনীতি মুন্সি প্রেমচাদের মতো সাহিত্যিককেও বলি দিয়ে দিতে পারে।

হিন্দির এই সর্বব্যাপী আগ্রাসনের ফলেই ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানের কাছে উর্দু হয়ে দাঁড়াল তাদের আত্মপরিচয়। আর পাকিস্তান রাষ্ট্রকল্প তাদের কাছে হয়ে দাঁড়াল হিন্দির দাপট থেকে মননের মুক্তাঞ্চল।

পর্দাপ্রথা ও নারী

আমি বেশ কিছুদিন আগে লিখেছিলাম, পর্দাপ্রথা একচেটিয়া আরবের সংস্কৃতি নয়। ভারতবর্ষে সুদূর অতীত থেকেই পর্দাপ্রথা ছিল। এই পর্দাপ্রথাকে অনেকে পুরুষতান্ত্রিক জুলুম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান। আমার মনে হয়, এই সরলীকৃত পশ্চিমা উপসংহারকে প্রশ্ন করা যায়।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের ভূখণ্ডে নারীরা প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা এবং তাদের ওপরে কোনো কিছুই চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; যদি না তারা নিজেরাই সেটা গ্রহণ করে। তারা নিজেদের মতো প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে। যদি আপনি সেই ভাষা পড়তে পারেন, তাহলে সেই প্রতিরোধের গল্প আপনাকে চমৎকৃত করবে। আপনি নারী সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চাইবেন।

আমি আপনাদের ইতিহাস থেকে নারীদের প্রতিরোধের তিনটে উদাহরণ দেবো। পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের পুরুষদের পোশাক পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। আমরা বেশিরভাগ পুরুষরা আনন্দচিত্তে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পশ্চিমা পোশাক গ্রহণ করেছি। নারীরা তাদের শাড়ি কিন্তু ছাড়েনি। কওমি মাদরাসাও তাদের পোশাক ছাড়েনি।

আমরা পশ্চিমের শিক্ষা নিয়েছি পুরোটা। ভ্যালুজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি, চিন্তা কাঠামো নিয়েছি। সবকিছুই আনক্রিটিক্যালি গ্রহণ করেছি। রান্নাঘর যেহেতু নারীরা সামলায়, তাই আমরা পশ্চিমা ফুড বা খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করিনি।

হিন্দুধর্ম পালনে নারীদের নানা বাধা থাকার কারণে, বাংলার নারীরা পরিবার আর সমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালনের ঐতিহ্য গড়ে তোলে। শত শত ব্রত পালনই এখন বাংলায় হিন্দু ধর্মের মূল আচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্রত পালন অনেকটা শুদ্ধাচার বা রোজা রাখার মতো। সারাদিন উপবাস থেকে শুদ্ধ চিন্তা করে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বাংলার নারীরা এই ব্রত পালন করে। ব্রত পালন করতে গিয়ে এক নতুন ধরনের ধর্মচর্চার জন্ম দেয়।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার অফিসে স্যুটিং হওয়া একটি হিজাবের বিজ্ঞাপন নিয়ে উঠা আলাপের সূত্র ধরে কিছু কথা বলা। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আমি আগ্রহভরে বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে ডেকে এনে এই বিজ্ঞাপনচিত্রের স্যুটিং করিয়েছি। আমি জানতাম না কীসের স্যুটিং হয়েছে। আমার অফিসে এর আগে বিশিষ্ট সেক্যুলার নির্মাতা আবু সাঈদ ভাইও একটা নাটকের স্যুটিং করেছেন। আমাদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অন্য কেউ যদি স্যুটিং করতে চান, আমি অনুমতি দেবো। কোনো অসুবিধা নেই।

সেই হিজাবের বিজ্ঞাপনে একটা ট্যাগলাইন ছিল, 'হিজাব আমার আত্মবিশ্বাস'। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, হিজাব কীভাবে আত্মবিশ্বাস হতে পারে?

https://nagorikpathagar.org

আমরা লিবারেল দুনিয়ার মূল্যবোধে পোশাক নিয়ে আলোচনা করি। পোশাক কি ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিধেয়, নাকি সমাজের ইচ্ছায় নির্ণীত? এটা মনে হতে পারে, পোশাকে ব্যক্তির ইচ্ছাই সর্বোচ্চ। এটা ভুল ধারণা। পোশাক আপনার হতে পারে, কিন্তু এটা আপনি নিজে দেখেন না, দেখে অন্যরা। শুধু আপনি ছাড়া আর সবাই সেই পোশাকে আপনাকে দেখে। অন্যরা আপনার পোশাক দেখতে বাধ্য হন। আপনার পোশাক অন্যের চোখকে পীড়া দিতে পারবে না। তাই আপনি যা খুশি তাই পরতে পারেন না। অন্যকে সেটা দেখতে হয়। 'আমার যা ইচ্ছা তাই পরব', এটা একটা ভ্রান্ত ও সমাজবিরোধী আকাঙ্ক্ষা।

তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে। পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির কি কোনো ভূমিকা নেই? অবশ্যই আছে। এটাই ব্যক্তির সাথে সমাজের নেগোশিয়েশন। সামাজিক সম্মতি উৎপাদন করা। যেটাকে ট্রেন্ড বলা হয়। সেটাই ট্রেন্ড হয়ে উঠে, যার পেছনে সামাজিক সম্মতি আছে।

আমার বয়সি যারা আছেন, তারা হয়তো মনে করতে পারবেন, একসময় বাংলাদেশে কাবুলি ড্রেসের ফ্যাশন শুরু হয়েছিল। প্রবল সামাজিক বাধায় সেই ফ্যাশন চলতে পারেনি।

যেই পোশাকে সামাজিক সম্মতি থাকে, সেই পোশাক পরলে তো ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়বেই। গণমানুষের ইচ্ছার পক্ষে দাঁড়িয়ে যে রাজনীতি করে, ঠিক একইভাবে সে দুর্দান্ত সাহসী হয়।

হিজাব শুধুই আরবীয় সংস্কৃতি নয়

এটি রাশান সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্যা গ্রেটের পোশাক। ক্যাথরিন রাশান ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ক্যাথরিনের সময়কে ধরা হয় 'রাশিয়ার গোল্ডেন এইজ'। তাঁর সময়েই রাশিয়া শৌর্যে-বীর্যে বলশালী হয়ে ওঠে। আজ আমরা রাশিয়ার যে সুবিশাল ম্যাপ দেখি, সেই দেশ তাঁর সময়েই গড়ে ওঠে। ১৭৬২ থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

এবার ভালো করে দেখুন পোশাকটা। কী দেখছেন? ভালো করে দেখুন। জি ভাই, হিজাব। হিজাব শুধু অ্যারাবিক কালচার নয়; নানা সংস্কৃতিতেই হিজাব বা হিজাব সদৃশ পোশাক আছে। তাঁর যে এই একটা পোশাক ছিল তা নয়;

https://nagorikpathagar.org

আরও পোশাক ছিল, এমনকী তাঁর একটা সামরিক পোশাকও ছিল। যদিও এই হিজাব পরিহিতা অবস্থায় তাঁর কোনো পোট্রেট নেই।

রাশান সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনের হিজাব। ছবি : পিনাকী ভট্টাচার্য

ওড়না চাই, রথ টানি

ওড়না নিয়ে কী সমস্যা? সকলেই গাইগুই করছেন, মনের কথাটা বলছেন না। তবে বাংলা ট্রিবিউনে দেখলাম একজন সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক মানসিকতা' থেকে পাঠ্যবইয়ে এটা দেওয়া হয়েছে।

তাদের কাছে একই বইয়ে 'রথ টানা' সাম্প্রদায়িক নয়। বড়োই আশ্চর্য কথা! 'ওড়না চাই' থাকলে যদি শিশুকে ওড়না পরানো উৎসাহিত করে, তাহলে 'রথ টানি' থাকলে কি শিশুকে হিন্দুধর্ম পালনে উৎসাহিত করে?

ওড়না কি মুসলমানদের পোশাক? ওড়না আবিষ্কার করেছে কি মুসলমানরা? ওড়না আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতায়। আর এটা জেন্ডার নিউট্রাল পোশাক। মেয়েরা পরলে ওড়না আর ছেলেরা পরলে উত্তরীয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেন—'ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়, পর পর পর তোমায় রঙ মেশাতে হবে....' তখন সেটা খুব সেক্যুলার হয়। আর 'ওড়না চাই' হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক!!

আমরা বুঝি, কোথায় জ্বলে। এবার থামেন প্লিজ। আর বেশি চিল্লাইয়েন না।

https://nagorikpathagar.org

খুশি ও বলি

ওড়না চাই।

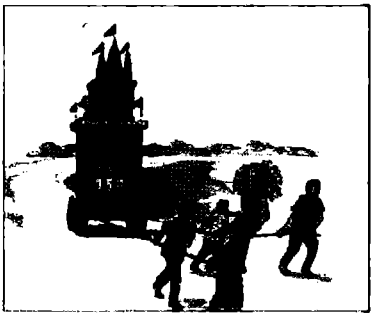

রথ টানি।

খ্রিষ্টধর্মে হিজাব

Sano di Pietro পঞ্চদশ শতকের একজন ইতালিয়ান পেইন্টার। সেই সময়ের অন্যান্য শিল্পীর মতো তিনি মূলত খ্রিষ্ট ধর্মীয় পেইন্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত। তাঁর একটা বিখ্যাত শিল্পকর্মের নাম St. Bernardino Preaching in the Campo of Siena। ইতালির শহর সিয়েনার ডেল ক্যাম্পো স্কয়ারে সেইন্ট বার্নারডিনোর ধর্মীয় বয়ানের ছবি।

লক্ষ করুন দুটো জিনিস। মহিলা আর পুরুষের সারির মধ্যে একটা কাপড় দিয়ে বিভক্তি আর মহিলাদের পরিধানে হিজাব।

ইউরোপের সকল খ্রিষ্টান নারীও একসময় হিজাব পরত। এখনও সেই আচার দেখা যায় খ্রিষ্টান নানদের মধ্যে। যেই পোশাক তাদের ঐতিহ্যের অংশ ছিল, সেটাকে ইউরোপ এখন ঘৃণা করে কেন? আজব বিষয়!

সিয়েনার ডেল ক্যাম্পো স্কয়ার এখনও ঠিক এমনিই আছে। শুধু হিজাব অন্তর্হিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

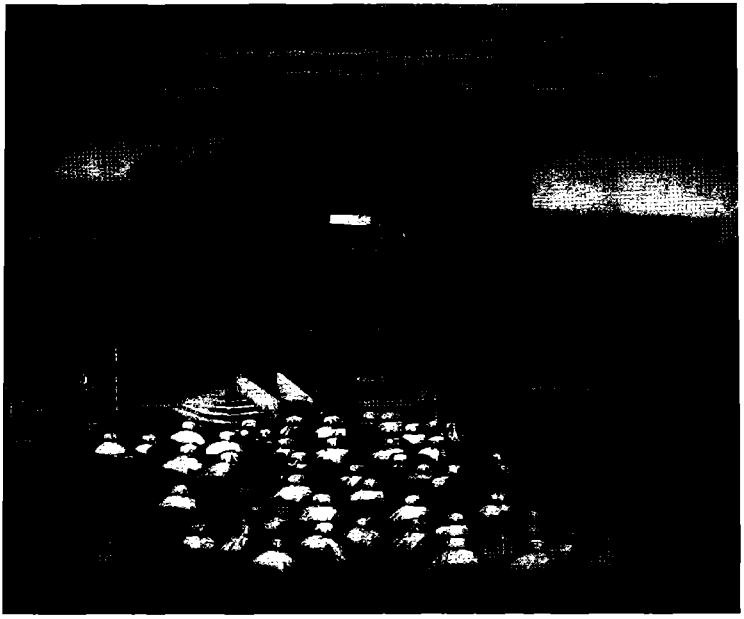

জাব নিয়ে ঘৃণার চাষাবাদ

ংলাদেশি সেক্যুলারদের এক শীর্ষ অনলাইন বুদ্ধিজীবী বন্ধুর বরাতে লিখেছেন—

> 'এই যে আমাদের দেশের মেয়েরা এখন হিজাব পরা শুরু করেছে, এদের দেখলে আমার ঘেন্না লাগে। যারা মাথার ওপর আলতো করে একটা ঘোমটার মতো পরে ওদেরকে অতটা না, কিন্তু ওই যে হিজাবিস্তারা আছে, ওদের দেখলে রীতিমতো বমি আসে।'

নি হিজাবকে ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারপরে কেন তিনি ব্যাধি লেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> 'হিজাব নামক এই বিচিত্র জিনিসটাকে কেন ব্যাধি বলছি? কারণ, এই কিম্ভূতকিমাকার জিনিসটা আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আসেনি। আর এই জিনিসটার পেছনে ফ্যাশন বা স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তার চেয়ে বেশি যেটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে হীনমন্যতা। যারা মাথার ওপর এই জঞ্জালটা পরে, ওরা নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে বলেই এ রকম উদ্ভট জিনিস পরিধান করে।

https://nagorikpathagar.org

এবং আপনি লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, হিজাব নামক এই অদ্ভুত জিনিসটা যারা পরে, এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটু মূর্খ প্রকৃতির হয়ে থাকে।'

তিনি লেখার উপসংহার টেনেছেন এইভাবে—

'যে বাঙালি মেয়েটি মাথায় একটা রঙিন কাপড় পেঁচিয়ে চূড়ার মতো করে সেখানে একটা পাথর ঝুলিয়ে হুর-এ-আরব সাজতে চাইছে, সাজুক; এটা ওর ইচ্ছা। কিন্তু ওকে দেখলে আমার করুণা হয়, একটু ক্রোধও হয়। বেয়াদব বেআক্কেল বেইমানের দল।'

দুর্বল জাজমেন্ট আর ভয়াবহ রেইসিস্ট ঘৃণা—এই দুই বৈশিষ্ট্য অবশ্য বাংলাদেশের সেক্যুলারদের একচেটিয়া দখলে। হিজাব কেন হঠাৎ করেই সারা পৃথিবীতে পুনরুত্থিত হলো প্রবল শক্তি নিয়ে; সেটা নানা গবেষক নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা লেইলা আহমেদের A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America; লেইলা মিসরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছেন ৫০-এর দশকে মিশরীয় মহিলারা ছুড়ে ফেলে পশ্চিমা আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করেছিল হিজাব। ৭০-এর দশকে তাদের পশ্চিমা আধুনিকতার মোহভঙ্গ হয়। এই মোহভঙ্গকে তারা প্রতিকায়িত করে হিজাব পরিধানের মধ্য দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় হিজাব বিষয়ে আরেকটা গবেষণা হয়, সেটার ফলাফল *Beyond the Hijab Debates: New Conversations on Gender, Race and Religion* বইতে ব্যাখ্যা করা হয়। সেই বইয়ে হিজাবসংক্রান্ত নানা ব্যাখ্যা আর বয়ানের একটা সারাংশ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, হিজাব উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের একটা প্রতীক, যেখানে নারী তার শরীরের অবজেকটিফিকেশনের বিরুদ্ধে হিজাবের মাধ্যমে প্রতিরোধ তৈরি করে। খুব ইন্টারেস্টিং মতামত।

লেইলা আহমেদ বলেছেন, হিজাবের বৈশ্বিক কারণ অবশ্যই আছে, তবে স্থানীয় কারণও গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে বাংলায় নারীরা তাদের পোশাক আর আচারের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধের বার্তা দিয়েছে। বাংলায় হিন্দু নারীরা ধর্মাচারণে সামাজিক বাধার কারণে তৈরি করেছে 'ব্রত'। পুরুষেরা পশ্চিমা পোশাক ধারণ করলেও বাঙালি নারীরা শাড়ি ছাড়েননি। সেই নারী যখন ব্যাপকভাবে কোনো একটা নতুন পোশাক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে, সেটাকে মূর্খতা বা বেয়াক্কেলি বলাটাই বেকুবি।

https://nagorikpathagar.org

নারীরা স্পষ্টতই হিজাব পরিধান করে একটা প্রতিরোধের বার্তা দিচ্ছে। নারীরা পশ্চিমা আধুনিকতাকে ত্যাগ করতে চায়। সমাজের ব্যাপক পশ্চিমাকরণ শুরু হয়েছে যখন থেকে, তখন থেকেই হিজাবের ব্যবহার ব্যাপকতর হয়েছে। বাংলাদেশ পশ্চিমা আধুনিকতার লিবারেল ভ্যালুজ যতটা না গ্রহণ করেছে, তার চাইতে বেশি গ্রহণ করেছে তার বিকৃতিকে। নারীরা নিরাপত্তাহীন হয়েছে আগের চাইতে অনেক বেশি। তাই সেই সময় থেকেই পশ্চিমা আধুনিকতার বিকৃতির বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। আর সেই প্রতিরোধের চিহ্ন পরিধান করে নারীরা পথ দেখাচ্ছে। সেই পথরেখা চিনে নেওয়াই আজকের কর্তব্য। আপনি কি চিনতে পারছেন সেই পথরেখা?

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি, হিন্দু মেডিকেলছাত্রী পর্দা বা হিজাব করছে ছেলেদের টিজিং চোখের আড়ালে থাকার জন্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থে। বাংলাদেশের অনেক পুরোনো জেলা শহরে মেডিকেল কলেজ হয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল সুবিধার কিছুই হয়নি। ফলে ওই শহরে থাকতে হয় নিজেকে সামলে। কারণ, সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে শহরে বদমায়েশদের দৌরাত্ম্য কম নয়।

সেই বুদ্ধিজীবী সবাইকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বানাতে চায়। ওর খেয়াল নেই, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' একটা আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, যেটা সে সবার ওপরে চাপাতে চাইছে। আপনি চাপাতে চাইলে প্রতিরোধ আসবেই, সেটা যেই মাত্রায়ই হোক না কেন।

কৌতুকের বিষয় হলো, তিনি বলছেন—'এদের ঘরে গিয়ে দেখবেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ নেই, শেক্সপিয়ার নেই, জীবনানন্দ নেই।' তিনি মনে হয় ঘরে ঘরে জরিপ করেছেন।

তাহলে আর কী, এদের শূলে চড়িয়ে দিন। কারণ, আপনার মতো নয় তারা।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি রাজনীতি ও প্রথা
কিছু ভ্রান্ত ধারণা

জিজিয়া কর কি নিপীড়নমূলক

মাঝে মাঝে আমার লেখায় সেক্যুলার নামধারীরা ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য 'জিজিয়া কর' বিষয়টা সামনে আনেন। এমনভাবেই আনেন যে, এই কর ছিল মুসলিমদের ধর্মবিদ্বেষ আর নিপীড়নের প্রতীক। আমার নিজেরও আগ্রহ ছিল বিষয়টা জানার।

মুশকিলটা আমরা করে ফেলি আজকের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ভ্যালুজ দিয়ে। সেই সময়ের একটা প্রথার মরাল জাজমেন্ট করে ফেলে। মধ্যযুগে জিজিয়া কর বা এই ধরনের ভিন্ন ধর্মের মানুষদের জন্য ধার্য কর অবিচার বা নিপীড়নমূলক ছিল না। আরও মজার বিষয় হচ্ছে—জিজিয়া করের মতো কর অন্য ধর্মের শাসকরাও বিধর্মীদের কাছ থেকে নিয়েছে। এটা সময়ের একটা প্রথা।

খ্রিষ্টানদের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে জিজিয়া করের মতো কর দিতে হতো বিধর্মীদের। এমনকী ভারতের হিন্দু গহড়বাল রাজ্যে বসবাসকারী তুর্কি মুসলিমদের রাজাকে 'তুরস্কদণ্ড' নামে কর দিতে হতো। নামেই পরিষ্কার, তুরস্কদণ্ড একটি বর্ণবাদী ও জাতিবিদ্বেষপ্রসূত কর।[২৭]

---

[২৭]. ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ১২০৬-১২৯০; এ বি এম হবিবুল্লাহ, অনিরুদ্ধ রায় অনূদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২৭৭-২৮১

https://nagorikpathagar.org

জামায়াত ও হেফাজতের লক্ষ্য কি এক

৪০৮ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি দেখলাম। সেখানে তারা যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে—'জামায়াত, হেফাজত আলাদা নাম হলেও এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। এরা সব সময় সকল ন্যায়সংগত আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে এবং এরাই মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে ১৯৭১-এ। আল্লামা শফীর শিষ্যরা পাকিস্তানি ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছে।'

আমি এই ৪০৮ জনের রাজনীতির জ্ঞান এবং ইতিহাসবোধ দেখে মুগ্ধ।

১৯৭১-এ ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল ছিল তিনটি—জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম পার্টি। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলামী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে, নেজামে ইসলামী দলটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল ছিল এবং মাঠে-ময়দানে অত সক্রিয় ছিল না। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে।

এর বাইরে বাংলাদেশের আলেম সমাজের বেশিরভাগই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। অনেকে ছিলেন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবও পেয়েছেন অনেকে। সেই সময়ের সর্বজনগ্রাহ্য বরেণ্য ইসলামি নেতা হাফেজ্জি হুজুর, মুক্তিযুদ্ধকে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ বলে ফতোয়া দিয়ে মাদরাসার ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দেশের বড়ো বড়ো মাদরাসাগুলো বন্ধ করে ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট মাদরাসার মুহাদ্দিসরা। এই সময় আমাদের পূর্বসূরিরা পাকিস্তান সরকারের বেতন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেছিলেন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডব শুরু হয়েছিল আর আমাদের প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা চাকরি করে কীভাবে?

বাংলাদেশে এই মাদরাসাগুলোই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র লড়াইয়ের উত্তরাধিকারী হয়েছে। যখন আপনাদের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশদের গোলামিতে ব্যস্ত ছিলেন। এরাই হাজি শরিয়তউল্লাহ, তিতুমিরের উত্তরাধিকারী, যারা জান বাজি রেখে মজলুমের পক্ষে লড়াই করে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজের সংশ্লিষ্টতার কারণেই 'এই মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে' পাকিস্তানিদের এমন প্রচার হালে পানি পায়নি।

https://nagorikpathagar.org

আর 'পাকিস্তানি ভাবাদর্শ'টা আসলে কী? পাকিস্তান হাসিলের লড়াই তো বঙ্গবন্ধুও করেছিলেন, বিবৃতিদাতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও করেছিলেন। পাকিস্তান হাসিলের লড়াই যে কারণে হয়েছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই তো স্বাধীন বাংলাদেশের লড়াই করতে হয়েছে।

তাদের কাছে 'পাকিস্তানি ভাবাদর্শ' মূলত 'ইসলাম'। তারা চান ইসলামের নাম-নিশানা যেন বাংলাদেশে না থাকে। এটা বলতে পারেন না বলেই ঘুরিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানি ভাবাদর্শ'। জামায়াতের দায় আপনি সবার ওপরে দেন কেন? জামায়াত আর হেফাজত এক?

মার্কস বলেছেন, 'ধর্ম হচ্ছে নির্যাতিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মাহীন অবস্থার আত্মা।' বাংলাদেশে যত দিন জুলুম থাকবে, নিপীড়িত মানুষ তার আচরিত ধর্ম ইসলামের ঝান্ডা তুলে প্রতিরোধ জারি রাখবে—এটাই মার্কসের শিক্ষা।

বেহেশতের টিকিট কেনাবেচা

বিডি নিউজে রাজু আলাউদ্দিন গোলাম মুরশিদ সাহেবের একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে ছাপিয়েছেন। গোলাম মুরশিদকে যারা চিনতে পারছেন না তাদের বলি, তিনি হচ্ছেন সেই 'হাজার বছরের বাঙালি' তত্ত্বের উদ্ভাবক। প্রথম আলো যাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন চাঙ্গে তুলছে। তাই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রথম সারির বরকন্দাজ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এখন দেশের বাইরেই থাকেন। কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তার মাঝে মাঝে বই বের হয়।

সেই সাক্ষাৎকারের শিরোনাম হচ্ছে—'আপনি শত কোটি টাকা চুরি করে শুধু যদি একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করে দেন, তাহলে পরকালে নিশ্চিত বেহেশত!'

তিনি এই কথা বলে যেটা বোঝাতে চাইছেন সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশে একটা মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। আর পরিবর্তনটা হচ্ছে, বেহেশতের টিকিট কেনাবেচা চলছে। ওনাকে কে এই তথ্য দিয়েছে সেটা জানার খুব ইচ্ছা আছে আমার।

https://nagorikpathagar.org

আদতে এই বেহেশতি টিকিট কেনাবেচার ব্যাবসা করেছিল ইউরোপের খ্রিষ্টতন্ত্র। চার্চের পাদরিরা তাদের বিল্ডিংসহ নানা কিছু আর্টিফ্যাক্ট 'বেহেশতের টিকিট' বলে বিক্রি করে চার্চের জন্য টাকা তুলত। এই ফাইজলামির বিরুদ্ধেই প্রোটেস্ট্যান্টরা বিদ্রোহ করে। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) এই বিদ্রোহের নায়ক। তাই তিনি সবচেয়ে রেডিক্যাল (পুতুপুতু না) প্রটেস্টানিজম ধারার নেতা। তবে বেহেশত কেনাবেচার এই ব্যাবসা আমরা কখনো করিনি। এটা আমাদের প্রাচ্যের ধর্ম-কালচারের প্রধান ধারায় নেই বা ইতিহাসেও নেই। তবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যা ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম এনডোর্স করে না (আমার জানা মতে)।

যারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করে দেন বা চাঁদা দেন, তারা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করেন, সেটা যারা দেন তারা নিজেরাই বলতে পারবেন। তবে অবশ্যই কেউ তাকে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে সে বিশ্বাস থেকে তিনি অর্থ দেন না। কারণ কমবেশি আমরা জানি, এভাবে কারও স্পিরিচুয়াল স্যালভেশনের বা মুক্তির নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

ধারণাটা হলো, কার বেহেশত হবে আর কার বেহেশত হবে না—এটা নির্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর। কোনো মাওলানা, পুরোহিত বা পাদরি এর নির্ধারক নন বা অন্য কেউ নন। এটা আল্লাহ আর বান্দার সম্পর্ক। বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা নিয়ে উত্তম কাজ ও ইবাদত করে যাবেন। তার আমলনামা একমাত্র আল্লাহই মূল্যায়ন করবেন। আমি শুনেছি, ইসলাম ধর্মে একমাত্র রাসূল ছাড়া ভিন্ন কোনো সুপারিশকারীরও কোনো জায়গা নেই। আলেম-ওলামারা এই বিষয়ে আরও ভালো বলতে পারবেন।

কিন্তু মূলকথা হচ্ছে, ধর্মকে হেয় দেখাতে প্রায়ই আমরা দেখি, ধর্ম বা ইসলামবিদ্বেষীরা এসব মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ ছড়ায়। দেখা যাচ্ছে, গোলাম মুরশিদ সাহেবও তাদের একজন হয়েছেন। তবে এই মিথ্যা প্রচারণা তার মতো দাবিকারী গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জন্য খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে। ধর্ম কেউ না মানতে পারেন, তিনি নাস্তিক হতে পারেন—এতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সেজন্য তাকে ধর্মবিদ্বেষী বা ঘৃণাবাজ হতে হবে—ব্যাপারটা এমন নয়। আপনার চায়ের কাপ এটা নয়, তাই আপনি খাবেন না। কিন্তু মিথ্যা মিথ্যা কেন চায়ের বদনাম করেন, জিনিসটা খুবই খারাপ। এমনটা আপনি বলতে পারেন না। এটা তৃতীয় শ্রেণির লোকের কাজ। চরম পেটের দায়ে পড়ে দু-একজন এমন করে থাকেন। তা গোলাম মুরশিদ সাহেব এমন কোনো ক্যাটাগরিতে পড়েছেন কি না শুনিনি!

https://nagorikpathagar.org

অনেক নাস্তিক মনে মনে ভাবতেছেন, ধর্মের নামে কি বাটপারি, ফ্রডারি নেই? অবশ্যই আছে সমাজে। ঠিক যেমন ডাক্তার না হয়েই ডাক্তারিতে কেউ এমন করে, ফ্রডারি আছে সেখানেও। সব পেশা বা চিন্তায় এমন আছে। কিন্তু সে কারণে ডাক্তারি বিদ্যাটাই খারাপ, তা তো আমরা বলি না। যে ফ্রডারি করে, তাকে খারাপ বলি। তাহলে ধর্মের বেলায় ধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যা বা কুৎসা রটাতে এত উশখুশ কেন এদের? এ ছাড়া আরও কথা হচ্ছে, একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করে দিয়ে কেউ যদি মানসিক শান্তি পায়, কেউ যদি মনে করে একটা ভালো কাজ করলাম (এটা তো খুবই দরকারি জিনিস), তাতে গোলাম মুরশিদ সাহেবদের সমস্যা কোথায়?

বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির গভীরে লুকিয়ে থাকা ধর্মবিদ্বেষ এভাবেই অসতর্ক মুহূর্তে প্রকট হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের বৈশ্বিক একক রাজনৈতিক কেন্দ্রের অনুপস্থিতি

হান্টিংটন তাঁর *ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন*-এ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন। সেটা হচ্ছে—কোনো বৈশ্বিক একক রাজনৈতিক কেন্দ্র না থাকা। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, সেই বৈশ্বিক কেন্দ্র হওয়ার জন্য তুরস্ক চেষ্টা চালাবে।

তুরস্ক মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার চেষ্টা চালালে কার লাভ, সেটা বুঝতে হলে তুরস্কের আজকের 'তুরস্ক' হয়ে উঠার ইতিহাসটা দেখা দরকার। ইউরোপকে ক্রুসেডে যেতে হয় মধ্যপ্রাচ্যতে। ক্রুসেডে শুধু তারা মধ্যযুগেই যায়নি; তারা আজকেও যাচ্ছে। আর খ্রিষ্টান দুনিয়ার এই ক্রুসেডে যাওয়ার রাস্তা ছিল তুরস্ক। তাই পশ্চিম বা খ্রিষ্টান দুনিয়া ক্রুসেড চালানোর জন্য এমন একটা বাফার অঞ্চল চেয়েছিল, যেই অঞ্চল হবে আত্মপরিচয়ে মুসলিম, কিন্তু পশ্চিমের মূল্যবোধে পুষ্ট। যেমন—ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালানোর জন্য আমেরিকার প্রয়োজন হয়েছিল থাইল্যান্ডের, আফগান যুদ্ধের জন্য পাকিস্তনের। ঠিক তেমনি পশ্চিমের সম্ভাব্য ক্রুসেডের জন্য সেই স্টেট হচ্ছে আজকের আধুনিক তুরস্ক। এই তুরস্কের সেক্যুলারিজম, কামাল আতাতুর্কের বিপ্লব সবকিছুই সেই বাফার স্টেট তৈরির প্রকল্প। যেই বাফার স্টেট আত্মপরিচয়ে যুক্ত থাকবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে। কিন্তু পলিটিক্যালি যুক্ত থাকবে পশ্চিমের সঙ্গে। এই তুরস্ক সেই কারণেই পশ্চিমা যুদ্ধজোট ন্যাটোর সদস্য।

https://nagorikpathagar.org

এই তুরস্ক যদি পৃথিবীর মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আখেরে কার লাভ? তুরস্কের যেকোনো পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে হলে তুরস্কের এই 'হয়ে উঠার' ইতিহাস আর তার ভবিষ্যতের স্বপ্নটাকে খেয়াল রাখা জরুরি।

ইমরান খান প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্যের জবাব

ইমরান খান বিজয়ের পর বলেছেন, তিনি মদিনার মতো করে দেশ চালাবেন। এটা দেখে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, ইমরান খান পাকিস্তানকে সপ্তম শতাব্দীতে পিছিয়ে নিতে চান। ইমরান খান তার দেশেকে যদি সপ্তম শতাব্দীতে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান আর দেশের জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছা যদি তাই হয়, তাহলে তসলিমার সমস্যা কোথায়?

তসলিমা এবং আমরা যে গণতন্ত্রের ধারণায় আস্থা রাখি, সেই গণতন্ত্রের জন্ম তো খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। তাহলে কি তসলিমা নিজে এবং আমরা বাংলাদেশকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নিয়ে যেতে চাই?

আসলে তসলিমার এই ফেনমেননটাকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ইরানের তাত্ত্বিক হামিদ দাবাসি তাঁর *ব্রাউন স্কিন ওয়াইট মাস্কস* বইয়ে। তিনি সেখানে দেখাচ্ছেন, মুসলমান সম্পর্কে পশ্চিমের যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, তার কারণ দুটি। একটা কারণ হচ্ছে পশ্চিমা মিডিয়া। যেমন : মুম্বাই শহরে ২০০৮ সালে সন্ত্রাসী হামলায় ১৭৩ জন মানুষ মারা গেলে সেটাকে ইসলামি সন্ত্রাস বলা হচ্ছে, যার দায় দেওয়া হচ্ছে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপরে। অথচ একই বছরে ইজরাইলের সন্ত্রাসী হামলায় ১৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত হলে সেটাকে ইহুদি সন্ত্রাসবাদ বলা হচ্ছে না এবং সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায়কেও এর দায় দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি দ্বিতীয় কারণ হিসেবে যেটা দেখাচ্ছেন, তা হচ্ছে—মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ্রেণির মানুষ যারা এসাইলাম নিয়ে পশ্চিমেই থাকে, তারা ক্রমাগতভাবে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে গেছেন। এই মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই চিৎকার করে পশ্চিমাদের কাছে বলে গেছেন, ইসলাম কোনো শান্তির ধর্ম নয়। 'ইসলামি সন্ত্রাস' শব্দযুগল তাদেরই আবিষ্কার। এরা নিজেদের ব্যক্তিগত সামান্য সুখের জন্য নিজ সম্প্রদায়কে বলি দিতে দ্বিধা করেনি। তিনি বেশ কয়েকজনের নাম করেছেন বইয়ে। তসলিমা যদিও সেই উচ্চতায় পৌঁছেনি যে তার নাম হামিদ দাবাসির বইয়ে আসবে।

https://nagorikpathagar.org

হামিদ দাবাসি এই ঘরের শত্রুম বিভীষণদের বলেছেন, নেটিভ ইনফর্মার। তসলিমা এবং আরও ডজনখানেক বাংলাদেশি আছেন, যারা আসলে হামিদ দাবাসির বলা সেই নেটিভ ইনফর্মার; তবে নিম্নস্তরের নেটিভ ইনফর্মার।

ইমরান খান কি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন

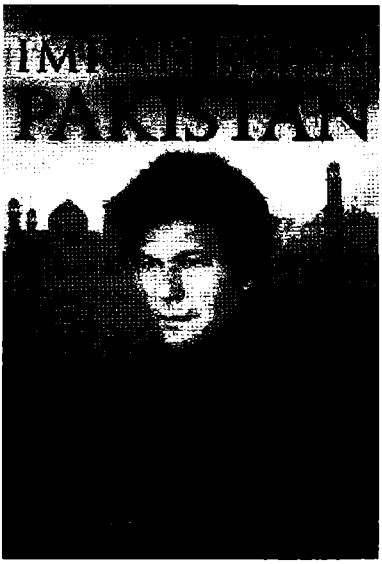

ভুট্টো পরিবার ও নওয়াজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ যখন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, তখন এই সাফল্য বড়ো করে উদ্‌যাপন করা উচিত ছিল পুরো দক্ষিণ এশিয়ায়; যে অঞ্চলটিতে পরিবারতন্ত্রের অভিশাপে যুগ যুগ ধরে সকল অধিকার হারিয়ে বসে আছে জনগণ। অথচ, ইমরান খান পাকিস্তানের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের চেতনাশিবির এই রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুঃখজনকভাবে মিথ্যাচারের ওপরে ভিত্তি করে প্রচারণায় নেমেছে।

তাদের প্রচারণার মূল ফোকাস হচ্ছে, ইমরান খান নাকি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেছেন। কচি, মাঝারি এমনকী বুড়ো সেক্যুলারপন্থিরা কোমর বেঁধে কোনো রেফারেন্স ছাড়াই এই প্রচারণার পালে বাতাস দিচ্ছে। এরা এমনকী এটাও দাবি করেছিলেন যে, ইমরান খান জেনারেল নিয়াজির ভাতিজা।

https://nagorikpathagar.org

ইমরান খান ২০১১ সালে *Pakistan: A personal History* নামে একটা বই লিখেন। বইটা প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ড থেকে। সেই বইয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা অংশ লিখেন। যখন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইমরান খান একজন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ। আমার বিবেচনায়, একজন পাকিস্তানি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার মূল্যায়ন ফেয়ার এবং ডিসেন্ট। আসুন, আমরা আগে বাংলা অনুবাদ পড়ে নিই তিনি কী লিখেছিলেন—

> '১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের দল আওয়ামী লীগ (যারা পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছিল) সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী হয়েছিলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন।
>
> পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানকে তাদের ভোটের ফলাফলকে অসম্মান করতে দেখে বিদ্রোহ করে। রাষ্ট্রপতি ও সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খান ভিন্নমত পোষণকারীদের দমন করার জন্য সেনা পাঠান। সেই একই সেনাদের তিনি ভিন্নমত দমনের কাজে পাঠান, যারা কিছুদিন আগেই একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করেছিল। সেনারা যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছল, তখন ভুট্টো ঢাকা থেকে করাচিতে ফিরে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে'। কিন্তু এই সামরিক অভিযানের ফলে এক ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার বেসামরিক লোক মারা গিয়েছিল, লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল।
>
> আমি সেনা অভিযানের আগে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্ডার-১৯ ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা শেষ বিমানের যাত্রী ছিলাম। আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তান দলের সাথে খেলছিলাম, তখন আমরা আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতার উত্তাপ টের পাচ্ছিলাম। এটা যে শুধু ঢাকা স্টেডিয়ামের দর্শকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আমাদের প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেও একই আচরণ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আশরাফুল হক, যিনি পরবর্তীকালে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন, তিনি সেদিন রাতেই ডিনারে বলেছিলেন,

https://nagorikpathagar.org

কেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এখানে জনমত এত প্রবল। তিনি বলেছিলেন, তার মতো অনেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চাইতেন, যদি তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হতো; তবে কিছুই কানে না তোলায় এখন সেই অধিকারের দাবি একটা শক্তিশালী স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি এটা শুনে বজ্রাহত হলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের মিডিয়া সেন্সরশিপের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আমার মতো অনেকের কল্পনাতেও আসেনি যে, দেশটা ভেঙে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে।

এরপর পশ্চিম পাকিস্তান একের পর এক মারাত্মক ভুল করে ভারতকে তার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার অবকাশ করে দেয়। সেই সময়ে ভারতের নেতৃত্বে ছিল নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধির হাতে। তিনি বাঙালি বিদ্রোহীদের সমর্থনে সেনা পাঠান। এবারের ফলাফল ভারতের সাথে পাকিস্তানের ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতো হয় না। পাকিস্তান দ্রুতই পরাজিত হয়। আমাদের সেনারা এক লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। আর ভারত ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দিকে তাদের দেশে নিয়ে যায়। আমাদের দেশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। ইন্দিরা গান্ধি জিন্নার পাকিস্তানের ধারণাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তার পিতার চাইতেও অধিক মুন্সিয়ানা দেখান। পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের আবাসস্থল হিসেবে, কিন্তু এই তিক্ত গৃহযুদ্ধ আমাদের সেনাবাহিনীকে আজও তাড়িত করে। এমন একটা বেদনাদায়ক পরাজয়ের পরে পাকিস্তান হয়ে রইল শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি আবাসস্থল।

এর কিছুদিন পর আমার আবার আশরাফুল হকের সাথে দেখা হলো। যে পরিমাণ বেসামরিক বাঙালি সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছে বলে তার কাছে জানলাম, আমি তাতে বজ্রাহত হলাম। দুই তরফেই যেই সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চিত করা দুরূহ। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে, কয়েক মাস ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং নিরাপত্তার কারণে লাখ লাখ মানুষ ভারতে পালিয়ে গেছে।

https://nagorikpathagar.org

আমি এর আগে আমার সমসাময়িক ভারতীয় আর ইংরেজ বন্ধুদের সাথে এই বলে তর্ক করেছিলাম যে, এটা পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগান্ডা। কিন্তু আশরাফুলের ভাষ্য শোনার পর আমি শপথ নিয়েছি, আর কখনো নিজ নাগরিকের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান নিয়ে আমার সরকারের প্রচারে আস্থা রাখব না।

আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ার তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। আমি ১৯৭১-এর সামারে পাকিস্তানের পক্ষে আমার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম ইংল্যান্ডে। সেখানে আমি পাকিস্তানের সেন্সরড মিডিয়া ও সরকারি টেলিভিশন থেকে দূরে ছিলাম। আমি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো দেখতে পারতাম। পাকিস্তানের পরাজয় দেখার বেদনা আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল, তার ওপরে যখন আমাদের সেনাদের চালানো গণহত্যার দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছিল।

এই মর্মবেদনা আরও তীব্র হয়েছিল এই কারণে যে, সরকার এবং সেনাবাহিনী বলে আসছিল, তারা শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাবে। আত্মসমর্পণের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে আমার ট্রাইবের একজন সদস্য জেনারেল নিয়াজি, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের সেনা কমান্ডার ছিলেন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বিবিসিকে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "সেনাবাহিনী শেষ মানুষ পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে।" পাকিস্তানি সেনাদের এই আত্মসমর্পণ গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছিল এবং দেশের ওপরে জনগণ বিশ্বাস হারিয়েছিল। অনেকের মতোই আমি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাস এনেছিলাম, যারা বাঙালি যোদ্ধাদের সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি, বিদ্রোহী এবং ভারত সমর্থিত যোদ্ধা বলে জানতাম, যা এখনও তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়, যারা পাকিস্তানের ট্রাইবাল এলাকা বেলুচিস্তানে লড়ছে।'

যেই বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের বিচার করতে অপারগ হয়, বাংলাদেশের নায্য পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হয়, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠাতে ব্যর্থ হয়; সেখানে বাংলাদেশের বাঙালি জাতিবাদী রাজনীতিতে পাকিস্তানের নামচিহ্ন আছে এমন শত্রুর উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন দরকার। যেন বারে বারে পাকিস্তান ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে সেই আদিপাপ থেকে আমাদের শাসকদের মুক্তি দেয়, তারা যেন বারবার সেই নামচিহ্নকে ক্রুসবিদ্ধ করে নিজে নিষ্পাপভাবে পুনরুত্থিত হয়।

https://nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি পরিত্যাগ

আমরা সকলেই জানি যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু নাইটহুড কি পরিত্যাগ করা যায়?

এটা সত্য, রবীন্দ্রনাথ লর্ড চেলমসফোর্ডের কাছে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন 'নাইটহুড' পরিত্যাগ করার ইচ্ছা জানিয়ে। তিনি লর্ড চেলমসফোর্ডের কাছে থেকে উত্তরও পেয়েছিলেন যে, এভাবে উপাধি পরিত্যাগ করা যায় না। তাই ওটা ফেরত নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু ইতোমধ্যেই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, উপাধি ফেরত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার মোহাম্মদ ইউসুফ ইসমাইল নাইটহুড পান। তিনিও একইভাবে ভাইসরয়ের কাছে তা ফেরত দিতে আবেদন করেন। তিনিও একই উত্তর পান যে, এভাবে নাইটহুড পরিত্যাগ করা যায় না।

স্যার মোহাম্মদ ইউসুফ তখন রবীন্দ্রনাথকে একটা চিঠি লিখে জানতে চান, কীভাবে নাইট উপাধি ফেরত দেওয়া হয়েছিল?

রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানান—

> 'আমি যখন নাইটহুড ফেরত দিয়ে চিঠি দিলাম, তখন আপনার মতো আমাকেও জানানো হলো যে, শুধু কাগজগুলো গভর্নরের কাছে ফেরত দিয়ে এটা পরিত্যাগ করা যাবে না। কেউ উপাধি না পেতে পারেন, কিন্তু উপাধি পরিত্যাগ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

https://nagorikpathagar.org

আমি নিজেও এই উপাধি ব্যবহার করি না, আমার বন্ধুদেরকেও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি না। আমি শুধু এটুকুই উপদেশ হিসেবে আপনাকে বলতে পারি।'

এর অর্থ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিত্যাগের আবেদন গৃহীত হয়নি এবং রবীন্দ্রনাথ এটাও জানতেন যে, এভাবে নাইট উপাধি ত্যাগ করা যায় না। তিনি শুধু ওই ঘটনার পর থেকে নাইট উপাধি ব্যবহার করেননি এবং বন্ধুদেরও ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করেছিলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথের উপাধি ত্যাগ করার কথা সর্বাংশে সত্য নয়।[১]

রবীন্দ্রনাথের চাপাতির ভয়

সকলেই জানেন, আমি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের নিপীড়িত বলে মনে করি। আমি দ্বিধাহীনভাবে ধর্ম হিসেবে ইসলামের এবং ইসলামের নবির প্রশংসা করি। নাস্তিকতার নামে নিউ অ্যাথিইস্টদের ইসলাম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কলম ধরি। মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নিউ অ্যাথিইস্টদের যে প্রতিক্রিয়াশীল ক্রোধ আছে, মাদরাসার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকারের মাধ্যমে মাদরাসাকে জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বলে নিউ অ্যাথিইস্টরা নিজস্ব বয়ান তৈরি করছে, তখনই আমি রাজা রামমোহন রায়ের মাদরাসায় পড়ার ইতিহাস তুলে এনেছিলাম। সেই ঘটনা জেনে নিউ অ্যাথিইস্টদের বিহ্বল ভাব এখনও কাটেনি। তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার সঙ্গে এই ঘটনা মেলাতে পারে না। ইসলাম প্রশ্নে আমার অবস্থানকে তারা ব্যাখ্যা করতে চায় এভাবে—

১. আমি জানের ভয়ে ইসলাম সম্পর্কে এই অবস্থান নিয়েছি।
২. কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, আমি ইসলামপন্থিদের কাছে নিয়মিত মাসোহারা পাই।
৩. বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে এটা আমার অস্তিত্বের কৌশল।

আমার অবস্থানকে কোনোভাবেই তারা একটি সেক্যুলার পজিশন বলে মানতে নারাজ। কারণ, মানুষ হিসেবে তারা অবিকশিত। তাদের চিন্তার প্রতিক্রিয়াশীলতা দিয়ে তারা দুনিয়ার সবকিছুকে বিচার করে। এই প্রসঙ্গে এবার বাঙালি মনীষীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা দেখি ইসলাম এবং ইসলামের পয়গম্বরকে নিয়ে। ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর মির্জা আলি আকবর খাঁর

https://nagorikpathagar.org

সভাপতিত্বে মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয় 'পয়গম্বর দিবস'। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠান। বাণীটি সেদিন পাঠ করে শোনান সরোজিনি নাইডু। রবীন্দ্রনাথ লিখেন—

> 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুরাগীদের দায়িত্বও তাই বিশাল। ইসলামপন্থিদের মনে রাখা দরকার, ধর্ম বিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না, সাহিত্যদ্রষ্টাদের বাণী নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যারা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন।'

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীকে। ১৯৩৪ সালের ২৫ জুন বেতারে রবীন্দ্রনাথের এই বাণী প্রচারিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেন—

> 'ইসলাম পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে ইহার অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যেসকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করতে হয়, তবে কেবল মাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্য দূতদিগের অমর জীবন হইতে চির উৎসারিত। অদ্যকার এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুসলিম ভ্রাতৃদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষীর উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।'

এ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বাণীটি প্রকাশিত হয় নয়াদিল্লির জামে মসজিদ প্রকাশিত *দ্যা পেশওয়া* পত্রিকার পয়গম্বর সংখ্যায়। ১৯৩৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠান। তৃতীয় বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেন—

https://nagorikpathagar.org

'যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন ও সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচারণের আদর্শ। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বর প্রদর্শিত পথ যারা অনুসরণ করেছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তারা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন, যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা অটুট থেকে যায়।'

একজন সত্যিকারের সেক্যুলার মানুষই পারেন এমন চিন্তা করতে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় চাপাতির ভয়ে এই লেখা লিখেননি অথবা এই লেখাগুলো তার কোনো কৌশলও নয়। ইসলামবিরোধিতাই যাদের কাছে প্রগতিশীলতার নামান্তর, তাঁরা অবশ্য এখন রবীন্দ্রনাথকেও জঙ্গি ঘোষণা করতে পারেন। ফরহাদ মজহারও 'এবাদতনামা'য় লিখেছিলেন—

'আমাদের রবিবাবু মস্তো বড়ো কবি, সাহেবেরা নোবেল প্রাইজ দিয়ে তার সাহিত্য কীর্তির করেছে কদর। ইংরেজের ঘেঁটু হয়ে তার বাপ-দাদা মালপানি কামিয়েছে। বনেছে স্বঘোষে জমিদার, কিন্তু বংশের দোষে জল পড়া পাতা নড়া প্রভু কভু বন্ধ হয় নাই- সে হয়েছে বিশ্বের শায়ের। তাহারে সালাম করি তাহারে মারহাবা কহি প্রাণে পরওয়ারদিগার তবু দিল্ মোর বহুত নাখোশ তার প্রতি। ছিল দোষ রবীন্দ্রের। তেনার কলমে বহু পয়-পয়গম্বর সাধক ও মনীষীর নাম হয়েছে স্মরণ, কিন্তু ঘৃণাক্ষরে নবী মোহাম্মদ আকারে ইঙ্গিতে ভাবে দিলে কিম্বা নিবের ডগায় একবারও আসে নাই, তাকে তাই মাফ করি নাই। ঠাকুরের বেটারে তুমি কিন্তু রহমান করে দিও মাফ।'

বোঝাই যাচ্ছে, তিনিও মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। আরেকদিকে একশ্রেণির ইসলামপন্থি রবীন্দ্রনাথ নামটিকে কলঙ্কিত করতে চায়। কল্পিত ঘটনা এবং কোনো রেফারেন্স ছাড়াই রবীন্দ্রনাথকে মুসলিমবিদ্বেষী বলে প্রচার করতে চায়। সেই নির্বোধরা জানেও না, রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করতে গিয়ে আসলে তারা কোন মহান মানুষকেই নিয়ত আঘাত করে চলেছে। অর্থহীন মানসিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের হাস্যকর এবং বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে মধ্যবিত্ত বাঙালির মানস থেকে।

https://nagorikpathagar.org

ব্যাংক লুটের একাল-সেকাল

বাংলায় প্রথম ব্যাংক লুট করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

আজকে আমরা যেভাবে ব্যাংক লুট দেখি, ঠিক একইভাবে ব্যাংক লুট করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। আমাদের সেক্যুলারদের নমস্য ব্যক্তিরাও যে একই কাজ করে গিয়েছিলেন এবং এই সো-কল্ড বাঙালি মর্ডানিস্টরা যে লুটের ঐতিহ্য ধারণ করে—তা আবিষ্কার করে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

১৮২৯ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তৈরি করেন ইউনিয়ন ব্যাংক। সেই ব্যাংকের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখার জন্য তিনি তার ঘনিষ্ঠ ও আজ্ঞাবহ রমানাথ ঠাকুরকে ব্যাংকের কোষাধ্যক্ষ বানান। ব্যাংকের অন্যান্য পদে পরিবর্তন হলেও ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রমানাথ ঠাকুর এই পদে কর্মরত থাকেন।

১৬ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। তিন বছরের মধ্যে ব্যাংকের মূলধন ১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল লুটপাট হয় হুন্ডির মাধ্যমে। তখন হুন্ডি বৈধ ছিল। লুটপাট চালাত দ্বারকানাথ নিজে ও নীলকরেরা। অডিটে এসব ধরা পড়লে দ্বারকানাথই সেসব ঝামেলা ঠেকাত। মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশই খেলাপি ঋণে পরিণত হয় ১৮৪৩ সালে, যার পরিমাণ ছিল সর্বসাকুল্যে ৭৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে ১৮ লাখ টাকা খেলাপি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোম্পানির।

খেলাপি ঋণের এই ৭৩ লাখ টাকা লুটেরারা সরিয়ে ফেললেও দ্বারকানাথ ঠাকুর পরিচালনা বোর্ডে বলেন—ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে, এখন লোকসান কত কমানো যায় সেই চেষ্টা করা উচিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর হিসাবের খাতাতেও কারচুপি করেন। এদিকে ব্যাংকের হিসাবরক্ষক এ এইচ সিমকে ১২ লাখ টাকা তছরুপের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি নিজের তহবিল থেকে ১২ লাখ টাকা শোধ করে দেন।

মূলধনের ১ কোটি টাকার ৯৩ লাখ টাকাই এভাবে লুটপাট হয়ে যায় ১৮৪৬ সালের মধ্যে। ১৮৪৬-এ ১ কোটি টাকা আজকের মূল্যে কত একটু হিসাব করবেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাবা ১৮২০ সালে শিপসরকারের হৌসে কাজ করে মাসে ২ টাকা রোজগার করে বাড়িতে টাকা পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন। সে সময় সব থেকে ভালো চাল ১ মন বালাম চালের দাম ছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা।

https://nagorikpathagar.org

লুটপাট শেষ হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর তার ৭০০ শেয়ারের মধ্যে সাড়ে ছয়শো শেয়ার বিক্রি করে কেটে পড়েন। তারপরেই ১৮৪৬ সালে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়।[২]

সূত্র :

১. 'দেশ'; ৫ মে, ১৯৯০ সংখ্যা।

২. দ্বারকানাথ ঠাকুর; কিশোরীচাঁদ মিত্র, অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সম্পাদনা : কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত, সম্বোধি পাবলিকেশন, ১৩৬৯; দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী; ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৭৬; দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক সমীক্ষা; রঞ্জিত চক্রবর্তী, গ্রন্থবিতান, ১৩৬৭; দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ; কৃষ্ণ কৃপালিনি, অনুবাদ ক্ষিতিশ রায়, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৮০

https://nagorikpathagar.org

বিবিধ : ভুল ধারণা

রাষ্ট্রধর্ম কি রাষ্ট্রের ধর্ম

আদালত রাষ্ট্রধর্মকে নিয়ে করা রিট খারিজ করেছেন। আমি গত ক'দিন এ নিয়ে নানা আলোচনা দেখলাম। একটা আরগুমেন্ট দেখলাম—'রাষ্ট্রভাষা যদি থাকে তালে রাষ্ট্রধর্ম কেন না?' আরগুউমেন্ট হিসেবে এটা আমার কাছে ঠিক মনে হয়নি। কারণ, 'রাষ্ট্রভাষা' নামের এই প্রপঞ্চটা যে কারণে তৈরি হয়, 'রাষ্ট্রধর্ম' সে কারণে তৈরি হয় না। রাষ্ট্রকে কথা বলতে হয়। সে লেখার মাধ্যমে বলে। রাষ্ট্রের আইন লিখে রাখতে হয়। রাষ্ট্রকে লেখার নির্দেশনা জারি করতে হয় যে, ওটা কোন ভাষায় করব? তাই একটা প্রধান ভাষা বেছে নিতে হয়।

তাহলে রাষ্ট্রধর্মটা কি বেছে নেওয়ার কাজ? মোটেই না। রাষ্ট্রকে তো ধর্ম পালন করতে হয় না। চাইলেও ধর্ম-কর্ম করতে পারবে না। ধর্ম মানুষের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য না। রাষ্ট্র পূজা করতে পারবে না, চার্চে যেতে পারবে না, নামাজ-রোজা করতে পারবে না। তাহলে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়টা কী? চারটা ইউরোপিয়ান দেশে রাষ্ট্রধর্ম আছে। সেক্যুলারিজমের ধারণা যাদের তৈরি, তারা রাষ্ট্রধর্ম করে কেন? করে কারণ, তাদের রাষ্ট্রে যে ধর্মই প্রধান, তাকে সেটা ঘোষণা দিতে হয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য। তাহলে রাষ্ট্রধর্ম হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য এবং রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম কোনটা, সেটা ঘোষণার জন্য। ইসলাম যে বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম আর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেটা তো আপনাকে ঘোষণা করতেই হবে।

https://nagorikpathagar.org

মানবতাবাদ : একটা জনপ্রিয় কিন্তু ভুল ধারণা

মানবতা, মানবতাবাদ বা মানবতাবাদী—এই শব্দগুলো আমাদের চিন্তার জগতে শিহরণ তোলে। আমাদের নিজেদের মানবতাবাদী বলে পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ হয়। মানবতা এবং মানবতাবাদী শব্দ দুটো আসলে কী বোঝায়? ইংরেজিতে এই শব্দটা হিউম্যানিটি। হিউম্যানিটি দিয়ে অবশ্য মানবজাতি ও মানবজীবন সম্পর্কিত চর্চা ও চিন্তাকে বোঝায়। অর্থাৎ মানবজাতির ইহজীবন, মনন, নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তাধারা ও মানুষের মৌলিক গুণ, বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

হিউম্যানিটি বা মানবতাবাদ হলো মানুষ বিষয়ে এক ধরনের মতাদর্শ, যা ডিভাইনিটির বিপরীতে মানুষই সব এবং সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এমন ধারণা প্রচার করে।

ওয়েবস্টার ডিকশনারি বলছে, হিউম্যানিজমের সহজ সংজ্ঞা হলো—

> 'A system of values and beliefs that is based on the idea that people are basically good and that problems can be solved using reason instead of religion.'

এটা হিউম্যানিটি নিজের সম্পর্কে কী মনে করে সে হিসেবে সংজ্ঞা হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব আদৌ রিজন দিয়ে বোঝা যাবে কি না, উপযুক্ত কি না, যথেষ্ট কি না, নাকি আরও কিছু লাগবে—সেসব চিন্তার পদ্ধতিগত প্রশ্ন। বলাই বাহুল্য হিউম্যানিটি ধারণার উদ্ভবের যুগে চিন্তার পদ্ধতিগত সেই প্রশ্নটা যথেষ্ট আলোকিত ও পরিষ্কার ছিল না। এককথায় বলা যায়—চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে ধর্মতত্ত্বকে বোঝার মতো শাণিত চিন্তাপদ্ধতি রিজন বা যৌক্তিক নয়।

বাংলা ভাষায় 'মানবতাবাদ' এই শব্দের উদ্ভব খুব বেশি দিনের নয়। একশো বছরেরও কম সময়। ১৩২৩ বাংলা সালে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে এই শব্দটা নেই। এটা বাংলা ভাষায় ঢুকেছে ১৩২৩ সালের পরে।

মানবতাবাদ বা হিউম্যানিটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রধানত গ্রিক প্রবচন 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি' এই নিরিখে ডিভাইনিটি বা ঐশী সত্তার বিপরীতে ব্যক্তি মানুষকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, আধার, শক্তি ও মূল্যবোধের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। মানবতাবাদের এই পুরো ধারণাই এসেছে চতুর্দশ থেকে ষোড়োশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগের সাথে হাত ধরে।

https://nagorikpathagar.org

মানবকেন্দ্রিক ও ইহজাগতিক এই শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল প্রাচীন গ্রিক রোমান সংস্কৃতিতে, আর তা দিয়েই এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়।

এ পর্যন্ত শুনে মনে হতে পারে 'ব্যক্তি মানুষ'ই তো সব; কিন্তু তা নয়। এখানে মানুষকে স্প্রিরিরিচুয়াল বিইং বা পরম সত্তার চেয়ে শক্তিমান বলে অনুমান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। 'ব্যক্তি মানুষ' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মানুষ সামাজিক এনটিটি। মানুষ মাত্রই সামাজিক মানুষ, কেবল সামাজিকভাবে (ব্যক্তিভাবে নয়) সে বিরাজমান। এটা মার্কসেরও কথা। অতএব, মানবতাবাদ শব্দটা শুধু ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বই নয়; এর উদ্ভবের পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসের ধারণারও বিরোধী। বলা যায়, মানবতাবাদ ধারণাকে নাকচ করেই কার্ল মার্কসের জন্ম। মানবতাবাদের ধারণা শুধু ধর্ম নয়; সামাজিক মানুষ হিসেবে মার্কসের এই ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ করে।

মজার কথা হলো, আমরা যত্রতত্র যাকে-তাকে 'মানবতাবাদী' বলে গুণ আরোপ করি। ভাবি, খুবই সম্মান করলাম; অথচ উলটা। যেমন : অনেক কমিউনিস্টকে কার্ল মার্কস সম্পর্কে বলতে বললে বলেন, উনি তো 'মানবতাবাদী' ছিলেন। কার্ল মার্কস আর যাই হোক, তিনি কোনো হিউম্যানিস্ট নন অথবা ইসলামের নবি সম্পর্কে বলবেন, নবি তো মানবতাবাদী (যারা ধর্মতাত্ত্বিকভাবে এই বাক্য পাঠ করবেন, তারা নাউজুবিল্লাহ পড়ে নেবেন)। অথচ মানবতাবাদ ধারণায় সব প্রশংসা এবং কৃতিত্ব নাকি মানুষের। কেবল মানুষের বন্দনা এবং ব্যক্তি মানুষের। সম্ভবত মানুষের জন্য আরেক মানুষের পরান কাঁদে– এই হিউম্যানিটি ধারণা থেকে তারা যাকে-তাকে 'মানবতাবাদী' বানিয়ে ফেলেন।

তবে 'আরেক মানুষের পরান কাঁদে' এই ধারণাটাও মূলত ধর্মতত্ত্বীয়। এনলাইটমেন্ট বা রেনেসাঁসের মানবতাবাদ ধারণা আসার অনেক আগের। এ ছাড়াও মনে রাখতে হবে, হিউম্যানিটির কেন্দ্রীয় ধারণা 'পরান কাঁদা' নয়; রিজন ও বুদ্ধিওয়ালা মানুষ, সেই মানুষের বন্দনা ও প্রশংসা। সব ক্রেডিট এই মানুষের এবং ব্যক্তি মানুষের।

আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, মানবতাবাদের এই ধারণা আমাদের ভূখণ্ডে এসেছে বামপন্থিদের হাত ধরে। এই ধারণাকে জনপ্রিয় করেছে বামপন্থিরা। মূলত এম এন রায় ভারতবর্ষে এই ধারণার আমদানি করেন এবং নয়া মানবতাবাদ নামে

https://nagorikpathagar.org

তার নতুন রাজনৈতিক চিন্তাকে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রাখেন। এই ভূখণ্ডের বামপন্থিরা, মার্কসের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে বলে এরা খোদ মার্কসের চিন্তার সাথেই যুদ্ধ করে গেছে চিরকাল, এখনও করছে।

'মুক্তমনা' ব্লগটি কাদের এবং তারা আসলে কী চায়

পনারা সকলেই একটি ছবি হয়তো অনেকবার দেখেছেন। যদি ইন্টারনেটে টি দেখেন তবে দেখবেন, ছবিটি বাংলাদেশে মুসলমানদের হাতে মসজিদের তরে এক হিন্দু হত্যার ছবি হিসেবেই পরিচিত।

গে এই ছবিকে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের চিত্র নিচে দেখুন, গুগলে সার্চ দেওয়ার পর এই ছবি ব্লগে কীভাবে ব্যবহার ছ।

https://nagorikpathagar.org

Pages that include matching images

Hindus of Bangladesh

hindubd.blogspot.com/ ▾
211 × 160 - Mar 22, 2013 - **Bangladesh** Puja Udjapon Parishad General Secretary Prashanta Kundu alleged that a quarter was attacking **Hindus** in a planned way to ..

Dozens of Hindu families are kept captive in a village of ...

hinduexistence.org/.../dozens-of-hindu-families-are-kept-capt... ▾
350 × 200 - Feb 19, 2015 - 28 **Hindu** families in a village in Patuakhali District in **Bangladesh** have been kept captive by fanatic Muslim cadres of Awami League under a

BANGLADESH: Muslim ethnic cleansing of Hindus the ...

www.barenakedislam.com/.../bangladesh-muslim-ethnic-clea.. ▾
540 × 595 - Jul 30, 2013 - The **Bangladesh Hindu** Buddha Christian Oikya Parishad formed a human chain in Chattagram to protest what they called 'heinous attacks' by

Learn religious persecutions on Hindus in Bangladesh ...

eastbengaleye.blogspot.com/.../learn-religious-persecutions-o.. ▾
394 × 300 - Mar 22, 2012 - The saga of religious persecutions on **Hindus in Bangladesh** is never-ending. It has never ended and there are no indications of its end in a ...

Ethnic Cleansing In Bangladesh - CNN IReport

ireport.cnn.com/docs/DOC-936660 ▾
464 × 353 - Mar 5, 2013 - The **Hindus in Bangladesh** are a minority group

সাধারণভাবে ইংরেজিতে ছবিটির বর্ণনায় আছে–

> 'In the photo above, Vimal Patak a Bangladeshi born Hindu, was beaten to death in a mosque with sticks as the Muslim mullahs chanted ÒKill the Kafir!'
> 'ওপরের ছবিতে বিমল পাঠক একজন বাংলাদেশি হিন্দু, তাকে মসজিদে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মোল্লারা সেই সময় "কাফির হত্যা কর" বলে চিৎকার করছিল।'

গুগলে ইমেজ সার্চে এই ছবিটা আপলোড করে 'hindus in Bangladesh' লিখে সার্চ দিলে কী আসে দেখুন। ওয়েল মডারেটেড কোনো ব্লগে এই ছবিটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ২০০২ সালে মুক্তমনায় একটি লেখায়। জনৈক রাহুল গুপ্ত 'Ethnic Cleansing In Bangladesh' নামে এই লেখাটা লিখেন। সেই লেখায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কিছু সত্যি ঘটনা ও ছবির সঙ্গে এই ছবিটিও দেওয়া হয়েছিল। ক্যাপশনে লেখা ছিল—

https://nagorikpathagar.org

'Fig: A Hindu being beaten by Muslims in a mosque in Bangladesh. He was captured outside the mosque while going home. After Friday prayers were over, the Muslims came out and grabbed the first Hindu they could. Mr. Vimal Patak a Bangladeshi born Hindu was beaten to death with sticks as the Muslim mullas (priests) chanted "kill the Kafir!" (non-muslim). With folded hands he begged for his life and died a brutal death.'

সংশ্লিষ্ট লেখাটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন–

ছবি ও ক্যাপশন যেভাবে দেওয়া ছিল মুক্তমনায়।

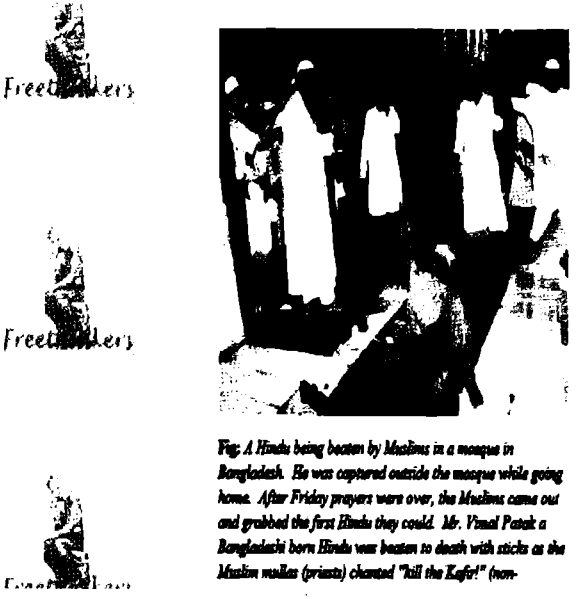

Fig: A Hindu being beaten by Muslims in a mosque in Bangladesh. He was captured outside the mosque while going home. After Friday prayers were over, the Muslims came out and grabbed the first Hindu they could. Mr. Vimal Patak a Bangladeshi born Hindu was beaten to death with sticks as the Muslim mullas (priests) chanted "kill the Kafir!" (non-

https://nagorikpathagar.org

পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ইন্টারনেটে এই ক্যাপশনটা মুক্তমনার লেখা থেকেই এসেছে। মুক্তমনার লেখাটি ছিল বিশুদ্ধ চোস্ত ইংরেজিতে। তাই এটা বুঝতে সমস্যা হয় না, কাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই লেখাটি লেখা হয়েছিল।

এই ছবিটা দেখলে বাংলাদেশের একজন হিন্দু অবশ্যই মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। বাংলাদেশের বাইরের দেশে আছেন—এমন হিন্দুরা ক্রোধান্বিত হবেন। বাংলাদেশের একজন মডারেট মুসলিম লজ্জিত হবেন। একজন ভারতীয় মুসলিম তাদের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণের আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কিছু ফ্যানাটিক মুসলিম হয়তো আনন্দিত হবেন। আর এই দুই সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ মুসলমানদের নির্ঘাত বাজে ভাষাতেই নিন্দা করবেন।

এই এক ছবি দিয়ে উদ্দেশ্য অনেক হাসিল করা হলো। দুই দেশের হিন্দু-মুসলিমদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস আর ঘৃণা জন্মানো গেল; আর মুসলিম পরিচয়টিকেও কলঙ্কিত করা হলো।

আসলে এটা কীসের ছবি...

ছবিটার ঘটনা ১০ জুন ২০০০ সাল। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কর্মীরা একটি সমাবেশ করছিল বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে। সেখান থেকে তারা জামায়াতের কর্মী সন্দেহে দুজনকে লাঠিসোটা নিয়ে ধাওয়া করে। সেই দুই ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে দৌড়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভেতর আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে বের করে এনে দুজনকে নির্মমভাবে পেটানো হয়। হাতজোড় করে মাফ চাইছে যেই লোকটি, তার নাম নূরে আলম সিদ্দিকী, আরেকজন গোলাম কুদ্দুস। ইনকিলাব পত্রিকায় লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি রক্তাক্ত হয়ে মেহরাবে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন রক্তপাত হয়েছিল, কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি।

এই খবর পরদিন ১১ জুন প্রায় সকল পত্রিকায় ছাপা হয়। ইনকিলাবে ছবিসহ খবরটি ছাপা হয়। যারা এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন, তারা আর্কাইভ থেকে ১১ জুন, ২০০০ সালের সেই ঘটনার ওপরে ইনকিলাবের খবর দেখুন।

https://nagorikpathagar.org

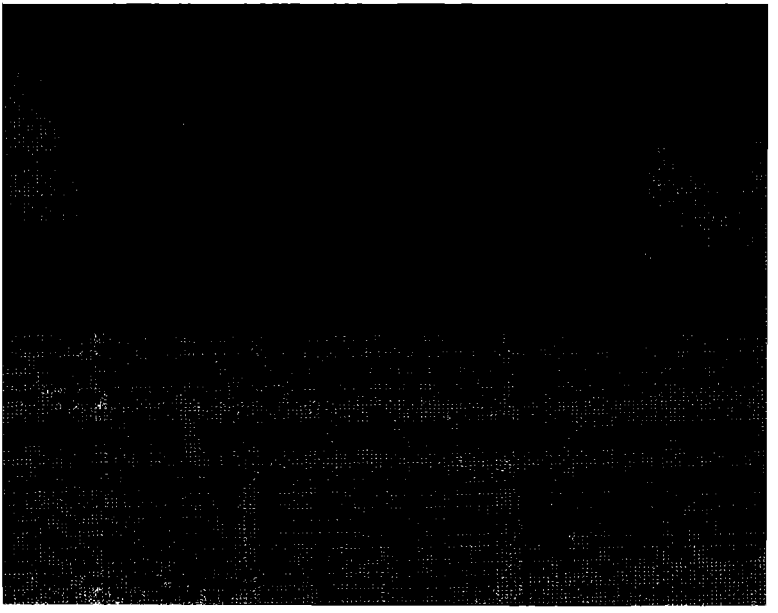

এবার পুরো পত্রিকাটি দেখুন

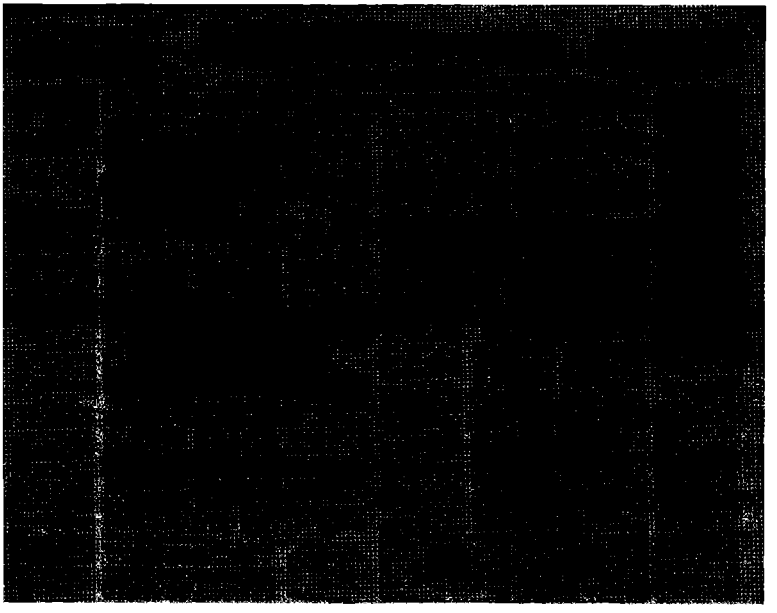

https://nagorikpathagar.org

যারা এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে তারপরও সন্দেহ পোষণ করছেন, তারা আর্কাইভ থেকে ১১ জুন ২০০০ সালের প্রতিনিধিত্বশীল বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার কপি সংগ্রহ করে দেখতে পারেন। এখানে প্রথম আলোতে প্রকাশিত খবরটি দেখুন।

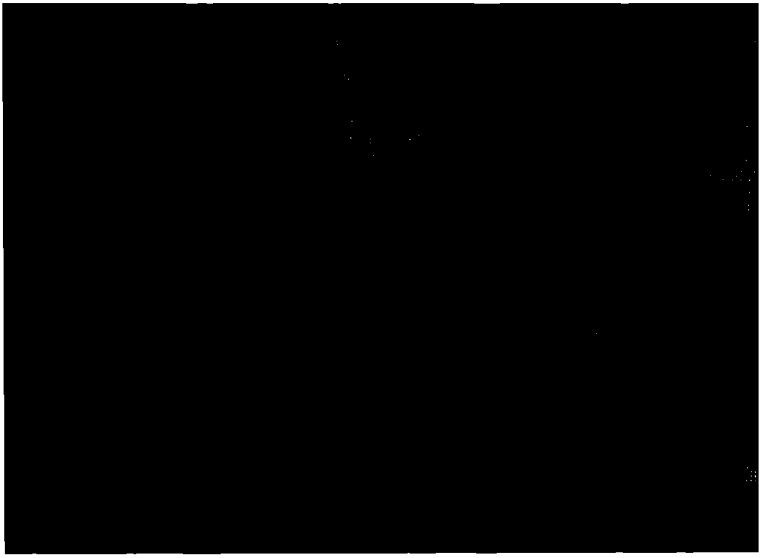

প্রথম আলো খবরটি আরও স্পষ্টভাবে দেখুন। প্রথম আলো অবশ্য লিখে—গোলাম কুদ্দুস একজন জামাত নেতা এবং নুরে আলম সিদ্দিকী সেই জামাত নেতার ড্রাইভার।

https://nagorikpathagar.org

ইনকিলাবের নূরে আলম সিদ্দিকীর সেই ছবিটিই বিমল পাঠক নামে একজন হিন্দুর ছবি বলে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ছবিটি ইজরাইলের একটি এন্টি মুসলিম ভিডিওতে ব্যবহার করা হয়েছে। বিজেপির তৈরি ভিডিওতেও ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ছবি ব্যবহার করে তৈরি ইজরাইলি ভিডিওটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন–

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশে কি হিন্দু নির্যাতন হয় না? নিশ্চয় হয়। কিন্তু সত্যের সাথে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা ঘটনা মিশিয়ে দিলে আখেরে কি সত্য ঘটনার আবেদন ও বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায় না? ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কর্মীদের এহেন নির্যাতন কি সমর্থনযোগ্য? মোটেও না। তবে এই ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন কারা এবং কাদের আশীর্বাদপুষ্ট সেটা আরেক আলোচনা। সেই আলোচনার সুযোগ এখানে আপাতত নেই।

মুক্তমনা ছবিসহ সেই লেখাটি সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু অবিকৃত মূল লেখাটি এখনও ওয়েব আর্কাইভে আছে। উপরন্তু তাঁরা সেই ভুল ছবি দেওয়ার দায় কখনো স্বীকার করেনি। যেই চেইন রিঅ্যাকশন তৈরি হয়েছে এই ছবি নিয়ে, যা আন্তর্জাতিক সেন্সন্যাল প্রচারণায় ব্যবহৃত হচ্ছে—তার দায় কার? যদি সেই ছবিতে সমস্যা থাকার জন্য লেখাটির কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা মুক্তমনা প্রকাশ্যে জানাল না কেন? কেনই-বা বলল না, এই ছবিটা ভুল? মুক্তমনা কোনো সাধারণ কমিউনিটি ব্লগ নয়, সেটা তারা তাদের নীতিমালায় ঘোষণা করেছে। তারা ঘোষণা করেছে—

https://nagorikpathagar.org

'১.২। মুক্তমনা কোনো চ্যাটরুম, ফোরাম, বন্ধুসভা কিংবা সোশ্যাল কমিউনিটি ব্লগের মতো গল্প-গুজবের স্থান নয়। এখানে মুক্তমনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ (১.১ দ্র.) লেখা এবং তা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়।'

১.১ দ্রষ্টব্য কী? দেখুন, '১.১। মুক্তমনা বাংলা ব্লগের উদ্দেশ্য যেকোনো ধরনের প্রগতিশীল, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত রচনাকে প্রাধান্য দেওয়া। কাজেই এই ব্লগের সদস্য হতে হলে এবং এখানে লেখা প্রকাশ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই মুক্তমনার উদ্দেশ্যের ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে।'

তার মানে এটা সিরিয়াস ব্লগ। যে কেউ চাইলেই কোনো লেখা সেখানে পোস্ট করতে পারে না। তাদের নীতিমালা দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন—

দীর্ঘদিন তাদের সাথে যুক্ত থাকলেই কেবল কোনো মডারেশন ছাড়া কেউ লেখা পোস্ট করতে পারে। এই রাহুল গুপ্তের আর কোনো লেখা নেই মুক্তমনায়। বিষয়টা অবিশ্বাস্য। ধুম করে এসে একটা পোস্ট দিয়েই উধাও। এই লেখার দায় থেকে মুক্তমনা অ্যাডমিন কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারে না। মুক্তমনা নামে ব্লগটি তাহলে এমন অনৈতিক ও ঘৃণ্য আচরণ করে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে? এই প্রশ্ন করা কি অসংগত?

https://nagorikpathagar.org

থেমিসের মূর্তি ভাঙা

নকশালেরা কোলকাতায় সত্তরের দশকে বিদ্যাসাগরের মূর্তির মাথা ভেঙেছিল। এটা নিয়ে একশ্রেণির মানুষ খুব হা-পিত্যেস করেছিল। কিন্তু যেই ছেলেটা বিদ্যাসাগরের মাথা ভেঙেছিল, বিদ্যাসাগর ছিল তার জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তি। তবুও সে কেন তার প্রিয় মানুষের মূর্তির মাথাটা ভেঙেছিল? আসলে সে তো বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙেনি; ভেঙেছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি বানিয়ে সেটাকে সামনে রেখে চোর-ডাকাত-শয়তানরা যেই ক্ষমতাতন্ত্র গড়ে তুলেছে তাকে। দেখুন নারায়ণ সান্যাল কী বলেছিলেন এই ঘটনা নিয়ে।

> 'কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর-মশায়ের মর্মরমূর্তির যেদিন মুণ্ডচ্ছেদ হয়, তার মাসখানেকের মধ্যে সিপিএম (এমএল) দলের এক নেতৃত্বস্থানীয় ছাত্রনেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! ঘটনাচক্রে সে আমার নিকটাত্মীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কট্টর নকশাল। আমার পেচকপ্রতিম বিরস মুখখানা দেখে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "বিশ্বাস করো ছোটোকাকু! মূর্তিটা যে ভেঙেছে, তাকে আমি চিনি। গত বছর হায়ার সেকেন্ডারিতে সে বাংলায় লেটার পেয়েছে। ওর সেই বাংলা প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধ এসেছিল তোমার প্রিয় দেশবরেণ্য নেতা। সে লিখেছিল বিদ্যাসাগরের ওপর।"
>
> আমি জানতে চেয়েছিলুম, "তাহলে ও বিদ্যাসাগরের মূর্তিটা ভাঙল কেন?" "বিদ্যাসাগরের মূর্তি তো সে ভাঙেনি। ভেঙেছে একটা ফেটিশ! ষড়যন্ত্রী মশাইরা যে ফেটিশের গলায় প্রতিবছর ২৬ শে সেপ্টেম্বর একটা করে গাঁথা ফুলের মালা দুলিয়ে দিয়ে বলেন, আগামীবার ভোটটা আমায় দেবেন কাইন্ডলি! দুঃখ করো না কাকু। সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি আবার বসাব।"'

কোটা সংস্কার আন্দোলনে যে ছেলেটা 'আমি রাজাকার' লিখেছিল, সেও নিজেকে রাজাকার দাবি করেনি। সে নিজের শরীরে সেই ফেটিশকে ধারণ করেছিল, যেই জুজুর ভয় দেখিয়ে সকল ন্যায়সংগত লড়াইকে ডিলিজিটিমাইজ করেছে শাসক।

এই প্রতিবাদের ভাষা জাফর ইকবাল বুঝবে না। কারণ, তিনি রাজনীতির মানুষ নন; স্রেফ দালাল।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের ভূখণ্ডে ন্যায়ের ধারণা

রোমের আইনশাস্ত্র বা জরিস্প্রুডেন্স সারা পশ্চিমের আইনশাস্ত্রের উৎস। এ কারণে গ্রিক দেবীর স্থাপত্য আমাদের বিচারালয়ের মাথার ওপর গেঁড়ে দিতে হবে—এমন কথা কেউ কেউ বলছেন।

আইন ও বিচারের বিষয়ে ইউরোপের অবদান আছে, এটা আমাদের অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু এর মানে কি এই যে, ইউরোপের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটার আগে অর্থাৎ আমরা ব্রিটিশ কলোনিতে পরিণত হওয়ার আগে আমাদের সিভিলাইজেশনে এই ভূখণ্ডে ন্যায়ের কোনো ধারণা ছিল না? অবশ্যই ছিল।

আমরা হিন্দু এবং মুসলিম—দুই ঐতিহ্য থেকেই ন্যায়ের ধারণা পেয়েছি। হিন্দু ঐতিহ্যে তো ন্যায়ই ধর্ম। মহাভারতের বা রামায়ণ মূলত ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক রচনা। যার উপস্থাপন নানা চরিত্রের মাধ্যমে গল্পের মতো করে। তাতে ন্যায়শাস্ত্রের মতো কঠিন বিষয় গল্পের কারণে সাধারণ্যেও একটা স্থান পায়। তত্ত্বগতভাবে সেকালের রাজা মানে প্রজার জন্য ন্যায় নিশ্চিত করাই যার ধর্ম; ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই রাজদণ্ড। আমরা তো সেই ঐতিহ্য থেকে এখনও বিচারপতিকে ধর্মাবতার (ধর্ম মানে ন্যায়) বা ন্যায়ের অবতার বলে ডাকার রেওয়াজ কোথাও কোথাও দেখি। এ ছাড়াও আমরা ন্যায়ের ধারণা পেয়েছি ইসলাম থেকে। ইনসাফ যেই ধর্মের কেন্দ্রীয় ধারণা। মোঘল আমলে কাজির বিচার মুসলিম ঐতিহ্যের এক দারুণ অবদান।

আমাদের ভূখণ্ডে ন্যায়ের ধারণা সব সময়েই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ধর্মাশ্রয়ী। কলোনি মাস্টাররা আমাদের সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়; যেন বলতে চায়, ন্যায়ের ধারণার একচেটিয়াত্ব হলো পশ্চিমের। এটাই হলো কলোনি গোলামির পক্ষে গোলামদের অক্ষম সাফাই। এই ভুলিয়ে দেওয়া প্রকল্পের শেষ পেরেক ছিল মডার্নিজমের নামে আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কহীন সেক্যুলারদের দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন প্রকল্প। থেমিসের মূর্তি শুধু বাংলার মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি অপমান নয়; হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতিও অপমান।

https://nagorikpathagar.org

ওড়না নিয়ে সেক্যুলার আপত্তি

'ওড়না' শব্দটা নিয়ে সেক্যুলারদের মূল আপত্তি ছিল শব্দটা 'মুসলমান গন্ধী'। যদিও তারা সেই কথাটা সরাসরি না বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, এই শব্দ দিয়ে শিশুমনেই নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। বাংলা ভাষায় 'ওড়না' শব্দটা ঐতিহাসিকভাবে গাত্রাবরণ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলা ভাষায় 'ওড়না' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলি-কীর্তনে ১৪৬০ সালে। শব্দটা ছিল তখন 'ওড়নি'।

'শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও
বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শন বরনারী
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।'

২৮ মার্চ, ১৮৯৪ রবীন্দ্রনাথ পতিসরে বসে লিখেন—'তপ্ত বাতাস ধুলোকালি খড়কুট উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে—প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগুবি ঘূর্ণিবাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখতে বেশ লাগে।'

'ওড়না' শব্দটা বাংলার ভাষা আর সংস্কৃতির সাথে এভাবেই সেই প্রাচীনকাল থেকেই যুক্ত হয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

ভাষা কখন রাজনীতি হয়ে ওঠে

জার্মান ভাষায় 'ব্যাড' বা 'খারাপ' শব্দের দুটো প্রতিশব্দ আছে। একটা 'শ্লেষ' আরেকটা 'ব্যেসে'। এলিটরা নিচুতলার মানুষের সম্বন্ধে ব্যবহার করে 'শ্লেষ', যা দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় অশ্লীল, অযোগ্য, খারাপ ইত্যাদি। আর 'ব্যেসে' ব্যবহার করে সমাজের নিচুতলার মানুষরা ওপরতলার মানুষের উদ্দেশ্যে, যা আরও এক্সপ্রেস করে অপরিচিত, অনিয়মিত, অভাবনীয়, বিপজ্জনক, ক্ষতিকর, নিষ্ঠুর ইত্যাদি।

https://nagorikpathagar.org

তাহলে সমাজের নিচুতলার মানুষ আর এলিটরা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ বিবেচনায় শব্দ বাছে। কে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে কী শব্দ ব্যবহার করছে, সেটা রুচির নয়; শ্রেণির। আরও বিশেষভাবে বললে ক্ষমতার প্রশ্ন।

এভাবেই আমরা ভদ্রলোকের একটা ভাষা আবিষ্কার করেছি। ভদ্রলোক কী ভাষায় নিজেকে এক্সপ্রেস করবে সেটার একটা প্রমিত রূপ দেওয়া হয়েছে। আর ছোটোলোক বা নন-এলিটদের আমরা ভাষার ব্যবহার দিয়ে রুচিহীন বলে চিহ্নিত করি।

সেলিম ওসমান নন-এলিটদের ভাষা জানে এবং সেটাকে তার পলিটিক্যাল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে। তাকে আপনি অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু তার শক্তির দিকটাকে রুচির বিষয় করে নিয়ে তাকে বাতিল করে দেওয়াটা নির্বুদ্ধিতা।

ভাষা কখন রাজনীতি হয়ে ওঠে, ক্ষমতার প্রশ্ন হিসেবে হাজির হয়, সেটা জানলে আপনার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

যেখানে বিজ্ঞান শেষ, প্রজ্ঞার শুরু সেখানেই

আত্মা কি আছে?

প্রশ্ন শুনে চমকে যাবেন না। প্রশ্নটা আমার নয়; আমার এক বন্ধুর। তিনি বাংলাদেশের একজন নামকরা সিনেমা পরিচালক। তিনি এসেছিলেন তার নতুন সিনেমার প্লট নিয়ে আমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে। আলোচনার শুরুতেই তিনি আমার দিকে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

আমি তাকে বললাম, 'আপনার এই প্রশ্নটাই ফান্ডামেন্টালি ভুল।'

তিনি ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'কেন?'

আমি বললাম, 'আমাদের যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ; মানে চোখ, কান, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে যেই জগৎকে প্রত্যক্ষ করি, সেই জগতে আমরা "আছে" বা "নেই" বিচার করি ইন্দ্রিয় বা বর্ধিত ইন্দ্রিয় (যেমন : টেলিস্কোপ ইত্যাদি) দিয়ে। যদি কিছুকে শনাক্ত করতে পারি অথবা না পারি তাহলে? তাই "আছে" বা "নেই" এটা একান্তভাবেই এই ফিজিক্যাল দুনিয়ার বা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের টার্ম।

https://nagorikpathagar.org

"আত্মা" একটা অতীন্দ্রিয় বিষয়, এটা আপনি আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তার মানে "আত্মা" ইন্দ্রিয়ের বাইরের জগতের বিষয়। সেই "ইন্দ্রিয়ের বাইরের" জগতে "ইন্দ্রিয়ের জগতের" কোনো নিয়ম খাটবে না। তবুও অতীন্দ্রিয় জগতের একটা বিষয়কে আপনি কেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের টার্ম "আছে" বা "নেই" দিয়ে প্রশ্ন তুলছেন? আপনাদের বিজ্ঞানমনস্কদের নিয়ে এটা একটা মারাত্মক সমস্যা। সবকিছু বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে চান।'

ঠিক এভাবেই নাস্তিকরা প্রশ্ন তোলে, ঈশ্বর কি আছে? ঈশ্বর কি এই জাগতিক জগতের কোনো বস্তু যে সেটার 'আছে' বা 'নেই' নির্ধারণ করবে ইন্দ্রিয়?

বুদ্ধি ও বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের যাই বলি না কেন, তার রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞান দিয়ে আমরা ওয়ার্কিং ট্রুথ বা কনজেকচার তৈরি করি সম্ভাবনার সীমায় বেঁধে। জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের কাজ 'সত্য' নির্ণয় নয়। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট জ্ঞানের এই স্তরের পরও আরেকটি স্তরের কথা বলেছেন। সেটা হলো 'প্রজ্ঞা'। জ্ঞানের স্তরে যুক্তি বা বিচারের স্ববিরোধিতা থেকেই যায়। বিজ্ঞান তার সীমানা জানে, তাই সে সম্ভাবনার বা প্রোবাবিলিটি উল্লেখ না করে কনজেকচার ঘোষণা করে না। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্করা সেই সীমানা মানে না। আপনি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের সীমানা ছাড়িয়ে। প্রজ্ঞার স্তরে আমরা বুদ্ধি বা মানুষের বিচারশক্তির সীমা ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে উঠি।

প্রশ্নটা হয়তো 'জ্ঞানের প্রশ্ন', তাই এটা স্ববিরোধী। 'প্রজ্ঞার প্রশ্ন' এমন হয় না। তখন হয়তো আপনি জিজ্ঞেস করতেন, 'আত্মা' সম্পর্কে আপনার মত কী? সেটার উত্তর দেওয়া সহজ। আমার কোনো মত না থাকলেও 'আত্মা' সম্পর্কে পৃথিবীতে যেসব মত আছে, সেটার বর্ণনা সম্ভব। কিন্তু আত্মা আছে কী নেই— এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে গণতন্ত্রের দার্শনিক উপাদান

সম্প্রতি টর্চার বা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের পক্ষে 'আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস' পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় আমাকে 'অধিকার' একজন আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

টর্চার করে স্বীকারোক্তি আদায় ছিল দাসদের জন্য একটি গ্রেকো রোমান আইন। এই প্রিজামশন থেকে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছিল যে, মালিকের ভয়ে দাসরা এতই ভীত থাকে যে, দাসদের কাছ থেকে সত্য স্বীকারোক্তির জন্য আরেকটি মাত্রাতিরিক্ত ভীতি তৈরি করতে হয়।

ঐতিহাসিকভাবেই টর্চার করা হয় মূলত কোনো অপরাধীকে নয়; বরং অপরাধ সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে—এমন অপরাধের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকেই। একটা মজার তত্ত্ব আছে অ্যালেন স্কারির। তার একটা বইও আছে *বডি ইন পেইন* নামে। সেখানে তিনি বলেছেন, টর্চারে মানুষের কনসাস বদলে যায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বদলে যাওয়া কনসাসের একজন মানুষের স্বীকারোক্তির কি আদৌ কোনো মূল্য আছে? এই টর্চার ইউরোপে আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় ফরাসি বিপ্লবের পর। অথচ এই ফ্রান্সই এর অনেক পরে আলজেরিয়ায় নিরপরাধ মানুষের ওপর শুধু তাদের টেররাইজ করার জন্যই টর্চার চালিয়েছিল।

পশ্চিমা লিবারিজমের যে সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে আমেরিকায়, তারাও তো ভয়ানক টর্চার করে। আবু গারিব কারাগার, গুয়ানতানামো বে এর উজ্জ্বল উদাহরণ। তাহলে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা আরও গভীরে। পশ্চিমা গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদের ওপর, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপকারের জন্য যেকোনো পদক্ষেপকে বৈধতা দেয়। টর্চারের বিরুদ্ধে ইউরোপে সবচেয়ে জোরালো দার্শনিক অবস্থান ছিল কান্টের। কান্টের এথিক্সের একটা বড়ো অংশ ছিল টর্চারের বৈধতাকে প্রশ্ন করা। কান্ট বলেছিলেন, মানুষের নিজস্ব লক্ষ্য আছে; সে নির্যাতনে বাধ্য হয়ে অন্য কারও লক্ষ্য পূরণের উপায় হতে পারে না। তাই এমন কোনো কাল্পনিক থিওরিটিক্যাল অবস্থাও নেই—যেখানে টর্চার বৈধতা পেতে পারে। মুশকিল হলো, কান্টের মতো এত বিশাল মাপের চিন্তাবিদও এই প্রশ্নে পশ্চিমে কঙ্কে পেলেন না। পেলেন না এই কারণেই, তা উপযোগবাদের মূলকে প্রশ্ন করতে পারেননি।

টর্চারের বা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মূল উৎপাটন করতে হলে রাষ্ট্র নামের এই প্রপঞ্চ যেই যেই প্রিজামশনের ওপর আর দার্শনিক ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেটাকেই প্রশ্ন করতে হবে। ডেমক্রেসির ধারণার মধ্যেই টর্চারের দার্শনিক উপাদান লুকিয়ে আছে।

https://nagorikpathagar.org

আলোচনাসভায় ফরাসি দূতাবাস থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিনি আমার এই আলোচনায় বিশেষ করে ফ্রান্সের সেই উদাহরণে বেশ লজ্জা পেয়েছেন। তিনি আমার নাম উল্লেখ করেই আলজেরিয়ার ঘটনায় ফ্রান্সের ভূমিকা নিয়ে তার লজ্জা ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্রীয় এই টর্চারের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের পথ অনেক লম্বা। এ ছাড়া আর কিই-বা বলার ছিল তার।

জাতীয়তাবাদ কি একটি আদর্শ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হলেও বাংলাদেশে দুঃখজনকভাবে জাতীয়তাবাদসংক্রান্ত ধারণাকে বামপন্থিরা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি এটা কৌতূহলজনক যে, তারা ৭১-এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিস্যাও ছাড়েন না।

জাতীয়তাবাদ কি একটি আদর্শ? একটা খুব আগ্রহউদ্দীপক প্রশ্ন এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এটা একটা অত্যন্ত পুরোনো বিতর্ক। অক্সফোর্ডের মিশেল ফ্রেডম্যান পলিটিক্যাল স্টাডিজ জার্নালে 'ইজ ন্যাশনালিজম অ্যা ডিস্টিক্ট ইডিওলজি?' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেন। আগ্রহীরা সেটা পড়ে দেখতে পারেন। তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ফারুকের বক্তব্যের উলটোটাই বলেছেন।

Adams তাঁর *পলিটিক্যাল ইডিওলজি অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক আইডিয়ালস* গ্রন্থে লিখেছেন–

> 'Nationalism and anarchism takes so many forms and are so entwined with so many different ideologies that we think it better not to treat them as distinct ideology. '

হেউড তাঁর *পলিটিক্যাল ইডিওলজিজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন* বইয়ে বলেছেন—

> 'Strictly speaking nationalism is not an ideology at all, in that it does not contain a developed set of interrelated ideas and values.'

ইডিওলজি আর পলিটিক্যাল কনসেপ্টের মধ্যে তফাত আছে। জাতীয়তাবাদ একটা পলিটিক্যাল কনসেপ্ট ইডিওলজি বা আদর্শ নয়। আদর্শ হতে হলে কোনো আইডিয়াকে সমাজ যেসব রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেয়, তার কম্প্রিহেন্সিভ না হলেও রিজনেবলি ব্রড উত্তর দিতে হয়। জাতীয়তাবাদকে যদি একটি আদর্শ হতে হয়,

https://nagorikpathagar.org

তাহলে তাকে এমন একটি কাঠামো দৃশ্যমান করতে হবে, যা জননীতিতে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনৈতিক ধারণায় সজ্জিত। কাঠামোর এই সামগ্রিকতা হয় সেই আদর্শকে তার গঠনের সময়েই মূর্ত করতে হবে অথবা আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংপ্রশ্নের (চ্যালেঞ্জের) মাধ্যমে মূর্ত হবে।

Lord Acton তাঁর *Nationality, in essays on Freedom and power* বইটিতে বলেছেন, জাতীয়তাবাদ একটি সর্বাঙ্গীণ আদর্শের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কারণ, জাতীয়তাবাদের ধারণাগত কাঠামো সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্পদের বণ্টন ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের কোনো উত্তর দেয় না, যা মূল ধারার আদর্শগুলো দেয়। উনি আরও বলেছেন, আদর্শ ও রাজনৈতিক ধারণা বা কনসেপ্ট হচ্ছে খাদ্য আর ওষুধের মতো। ওষুধ খাদ্যের কাজ করতে পারে না, তবে ওষুধ খাদ্যের শোষণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

জাতীয়তাবাদ যে আদর্শ নয়, এটা রাজনৈতিক দর্শন বা ধারণার ইতিহাসে নিস্পত্তি হয়েছে বহু আগে। এই প্রমাণিত বিষয়টি নিয়ে ফারুক কেন নতুন বিতর্ক শুরু করলেন, সেটা অবশ্য একটা প্রশ্ন হওয়ার যৌক্তিকতা রাখে।

ভারতবর্ষ ও এশিয়ায় চুম্বন

প্রকাশ্য চুম্বন আমাদের সংস্কৃতির সাথে যায় না। এটা অনেকেই বলছেন, কিন্তু কেন যায় না? কোথায় এটা সাংঘর্ষিক? এটা নির্ভর করে চুম্বনের কালচার সমাজতাত্ত্বিকভাবে সেই নির্দিষ্ট সমাজে কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

গ্রিকরা যৌনচর্চা হিসেবে প্রথম চুম্বন শেখে ভারতবর্ষ থেকেই, যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। ধারণা করা হয়, গ্রিক থেকে চুম্বন শেখে ইউরোপ। ইউরোপে চুম্বন ভালোবাসার প্রতীক। চুম্বনের কালচার এভাবেই ইউরোপে বিবর্তিত হয়েছে। তাই ইউরোপে প্রকাশ্যে এই ভালোবাসার প্রকাশে বাধা নেই।

ভারতবর্ষ এবং এশিয়ায় চুম্বন ভালোবাসার প্রতীক নয়; বরং যৌন সঙ্গমের অংশ। তাই চুম্বন একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, কাউকে দেখানোর বিষয় নয়। এশিয়ান কোনো দেশেই সেই কারণে প্রকাশ্যে চুম্বন সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। ইউরোপিয়ানরা যখন প্রথম জাপানে যায়, তখন তারা ভেবেছিল জাপানিরা বোধ হয় চুম্বন করে না। কারণ, চুম্বন জাপানে প্রকাশ্য নয়; এমনকী জাপানি ভাষার রোমান্টিক চুম্বন প্রকাশ করার জন্য কোনো শব্দও ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের চুম্বনের পশ্চিমা বয়ান এবং বিবর্তনের ইতিহাস গ্রহণ করতে হবে, নইলে আমরা আধুনিক নই—এমন নির্বোধ আবদার বোধ হয় বাংলাদেশেই সম্ভব। আমাদের চুম্বন শিখতে হবে ইউরোপের কাছে থেকে!

একজন কিশোর স্টিভ জবস

এই কিশোরটি একজন সিরিয়ান মুসলিম রিফিউজির পুত্র। সেই রিফিউজির নাম আবদুল ফাত্তাহ জান্দাল।

এই ছেলেটি বড়ো হয়ে বিশ্বজয় করে তাঁর মুসলিম সেমেটিক রিফিউজি অতীত মুছে পুরোদস্তর আমেরিকান হয়ে ওঠেন। আমরা তাকে স্টিভ জবস বলে চিনি।

ট্রাম্প বলেছেন, সিরিয়ান রিফিউজিদের আমেরিকায় আসা আরও আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। আসলেই স্টিভ জবসের বাবা আসার আগেই বন্ধ করে দিলে বুঝতিস, 'কত ধানে কত চাল'!

https://nagorikpathagar.org

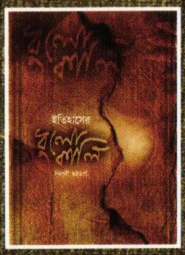

বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ানে অনেক ঐতিহাসিক বিষয়কেই ভুলভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ইতিহাসের এই ভুল উপস্থাপনের একটা হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ভুল ইতিহাস চর্চা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আর আত্মপরিচয়ের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছে। ইতিহাসের ওপরে এই আরোপিত ভুল চর্চার ফলাফল হয়েছে মারাত্মক। ইতিহাসের ভুল আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত বয়ানের ফলেই বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতি চর্চার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই ভুল ইতিহাস চর্চাকে অবাধে চলতে দিলে ইতিহাসের এই উদ্দেশ্যমূলক বয়ানই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সত্য বলে ধরে নেবে। ইতিহাসের ওপরে জমে থাকা ধুলোকালিকে যতটুকু পরিচ্ছন্ন করা যায়, ততই আমাদের জাতির মঙ্গল।

'ইতিহাসের ধুলোকালি' গ্রন্থ আমাদের ইতিহাসের গায়ে লেপ্টে থাকা ধুলোকালি ঝেড়ে পরিষ্কার করার একটা প্রয়াস।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789848 254042

https://nagorikpathagar.org